শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য আট আনা

প্রকাশক
শ্রীসলিল কুমার মিত্র
এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন,
কলিকাতা।

আশ্বিন—১৩৪১

প্রিণ্টার—
শ্রীমতীন্দ্রনাথ সিংহ
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন,
কলিকাতা।

— পরিচয় —
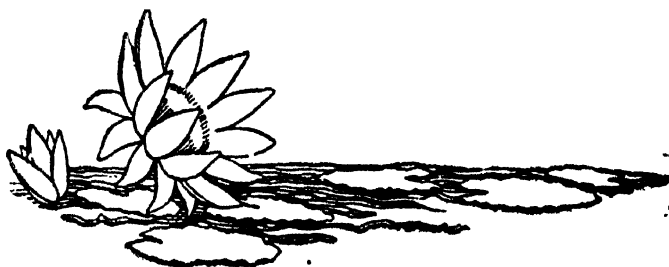
বিনুর জলপানি

বিনোদ যখন সেকেণ্ড্ ক্লাশ থেকে ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠ্‌ল, তখন তার ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহাশয় তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বললেন,—'বিনু, এখন থেকে তোমাকে স্কুলের মাইনে দিতে হবে ; না দিলে নাম কাটা যাবে।'

বিনুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে ভারি গরীবের ছেলে ; মাইনে দিয়ে ইস্কুলে পড়বার তার ক্ষমতা নেই। এতদিন সে বিনা বেতনেই পড়েছে। কিন্তু আজ হঠাৎ এ কি হল ? সে ক্ষীণস্বরে বললে,—'কিন্তু স্যার, আমি ত বেশ ভাল করেই পাশ করেছি।'

হেড্‌মাষ্টার মশায় দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন,

'সে আমি জানি বিনু; তুমি ভাল ছেলে। আমার যদি কোনো হাত থাক্‌ত তাহলে আমি তোমায় জলপানি দিতাম—কিন্তু—'বলে তিনি আবার মাথা নাড়লেন।

বিনু ধরা-ধরা গলায় বললে,—'আমি কি কোনো দোষ করেছি, স্যার?'

মাষ্টার মশায় বিনুর পিঠে হাত রেখে বললেন,—'না, তুমি কোনো দোষ করনি। কিন্তু তোমার বাবা—' এই পর্য্যন্ত বলে কথাটা পাল্‌টে নিয়ে বললেন,—'এর ভেতর অনেক কথা আছে, তুমি ছেলেমানুষ সব বুঝবে না। আমি বলি তুমি এক কাজ কর। জমিদার ভূপতি বাবু হচ্চেন স্কুলকমিটির প্রেসিডেণ্ট, তুমি তাঁকে গিয়ে ধর। তিনি যদি হুকুম দেন তাহলে আর কোনো গোল থাকবে না।'

বিনু আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল। দশখানা গ্রামের মধ্যে এই একটি হাই ইস্কুল। বিনুর কত আগ্রহ, কত উৎসাহ ছিল এখন থেকে জলপানি পেয়ে যদি পাশ করতে পারে তাহলে কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়্‌বে। বি-এ, এম্‌-এ পাশ করে আবার গ্রামে ফিরে আসবে। কিন্তু এখন? কলেজে পড়া ত দূরের কথা, স্কুলের মাইনে যোগাবে সে কোথা থেকে? তার বাবা অন্য ধরণের লোক। বিনু লেখা-পড়া ছেড়ে দিলেই বোধ হয় তিনি বেশী খুশী

হন। তিনি কেবল ত্নুনিয়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াতে ভালবাসেন। বিন্নু নিজের আগ্রহেই এতদূর পর্য্যন্ত পড়তে পেরেছে—বাবাকে পড়ার খরচ দিতে হলে কোন্ কালে তাকে ইস্কুল ছেড়ে দিতে হ'ত।

রাস্তায় যেতে যেতে সে ভাব্‌তে লাগল, জমিদার ভূপতি বাবু বেশ ভাল লোক—খুব দয়ালু আর ধার্ম্মিক। তিনি কি তার এই সামান্য প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন না? তাঁর এত টাকা আছে—তা থেকে কয়েকটা টাকা তিনি মাসে মাসে বিন্নুকে দেবেন না? ভূপতি বাবুর দয়ার ওপরেই তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—ভাবতে ভাবতে বিন্নুর চোখ দিয়ে জল পড়ল।

জমিদার বাড়ীতে গিয়ে সে দেখলে ভূপতি বাবু বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে তামাক খাচ্চেন। সে বিনীতভাবে নমস্কার করে দাঁড়াতেই জমিদার বাবু তার দিকে ফিরে বললেন, 'কি চাও?'

বিন্নু সঙ্কুচিতভাবে থেমে থেমে নিজের বক্তব্য বললে। নিজের দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করতে তার ভারি লজ্জা করতে লাগল—কিন্তু তবু সে সব কথা বললে। লেখাপড়ার দিকে তার এত আগ্রহ যে সেজন্য সে আগুনে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করত না।

সমস্ত শুনে জমিদার ভূপতি বাবু বললেন,—'হুঁ। তুমি হারাণ হালদারের ছেলে না?'

ক্ষীণস্বরে বিনু বললে,—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জমিদার প্রশ্ন করলেন,—'তোমার বাপ তোমার ইস্কুলের মাইনে দিতে পারে না?'

বিনু চুপ করে রইল।

জমিদার তখন চড়া সুরে বললেন,—'ছেলের ইস্কুলের মাইনে যে দিতে পারে না, সে জমিদারের সঙ্গে মামলা করতে আসে কোন সাহসে?'

একথার বিনু কি উত্তর দেবে? সে ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার বুকের মধ্যে কান্না গুমরে উঠ্‌তে লাগল।

জমিদার বাবু ফাটকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—'যাও। এখানে কিছু হবে না।'

গ্রামের পূর্ব্বদিকে তিনচার-মাইল জায়গা জুড়ে জঙ্গল। আগে বোধহয় ঐ জায়গাটায় কোনো বড় শহর ছিল, তার পর ভূমিকম্প বা ঐ রকম কোনও কারণে নগর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখনো জঙ্গলে ঢুকলে বড় বড় বাড়ীর ইট-পাথর স্তূপীকৃত হয়ে আছে দেখা যায়। সেই সব ভাঙা ইমারতের ফাটলে ফাটলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট-অশ্বত্থ

বিন্নুর জলপানি

"যাও এখানে কিছু হবে না-

আরো কত রকম গাছ গজিয়েছে। কেবল একটি পাথরের কালী মন্দির এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে অটুট আছে—এমন কি, তার লোহার ভারি দরজাটা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়নি। কিন্তু দিনের বেলাও এখানে অন্ধকার হয়ে থাকে—জঙ্গলের ঘন পাতা আর ডাল-পালা ভেদ করে সূর্য্যের আলো ঢুকতে পারেনা। গ্রামের লোকেরা সহজে এ জঙ্গলে ঢুকতে চাইত না; তবে মেয়েরা কখনো মানতের পূজা দেবার জন্যে কালীমন্দিরে যেত, কিন্তু সন্ধ্যে হবার আগেই আবার গ্রামে ফিরে আসত। সন্ধ্যের পর এ জঙ্গলে ঢোকবার কারু সাহস ছিল না।

এই জঙ্গলটি ছিল বিনুর বেড়াবার জায়গা। দিনের বেলা একটু অবকাশ পেলেই সে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ত। বনের মাঝখানে, কালীমন্দিরের কাছেই একটা প্রকাণ্ড উঁচু অশ্বত্থ গাছ ছিল; তার মাথা অন্য সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে গ্রাম থেকে দেখা যেত। এই গাছটি ছিল বিনুর বৈঠকখানা। ছুটির দিনে সে বই পকেটে করে সেই গাছে গিয়ে উঠ্‌ত। গাছের প্রায় মগ্‌-ডালের কাছে সে দড়ি দিয়ে একটি দোল্‌না তৈরী করেছিল, নীচে থেকে দোল্‌না দেখা যেত না। তাইতে আরাম করে বসে সে বই পড়ত—ঘুম পেলে ঘুমিয়েও নিত। তার এই গোপন আস্তানাটির কথা কেউ জান্‌ত না।

বিন্নুর জলপানি

সেদিন বিকেল বেলা জমিদার বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে বিন্নু বাড়ী গেল না; পা দুটো তার অজান্তেই তাকে বনের দিকে টেনে নিয়ে চলল। জমিদারবাবুর কড়া কথাগুলো তার প্রাণে বিঁধেছিল; কিন্তু তার চেয়েও বেশী কষ্ট দিচ্ছিল তাকে এই চিন্তা যে, সে আর পড়তে পাবে না। কোথায় পাবে সে টাকা? বাবাকে বলতে গেলে তিনি বলবেন,—'ঢের ল্যাখাপড়া হয়েছে; এবার আদলতের মুহুরীর কাজ শেখ। কাল থেকে আমার সঙ্গে সদরে বেরুতে হবে।' বাবার সঙ্গে মোকদ্দমার কাগজ বগলে করে সদরে যেতে হবে, ভাবতেই বিন্নুর চোখ জলে ভরে উঠল।

ঘন ঘন চোখের জল মুছতে মুছতে যখন সে তার প্রিয় গাছটির তলায় গিয়ে দাঁড়ালো তখন সন্ধ্যে হতে আর দেরী নেই—গাছের নীচে অন্ধকার জমাট বেঁধে এসেছে। কিন্তু তবু বাড়ী ফিরে যেতে আজ তার মন সরল না। সে গাছে উঠে দোলার ওপর চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। গাছের মগডালে তখনো বেশ আলো আছে; সেখান থেকে জমিদার বাবুর উঁচু পাকা বাড়ী স্পষ্ট দেখা যাচ্চে।

ভেবে ভেবে বিন্নু কোনো কূল-কিনারা পেলনা।

জমিদার বাবুর ওপর বিনু রাগ করতে পারে নি, শুধু নিজের ব্যর্থ জীবনের কাথাই সে ভাব্‌ছিল। ক্রমে রাত্রি ঘনিয়ে এল। পাখীরা যে-যার বাসায় রাত্রির মত আশ্রয় নিলে। তখন সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নাম্‌তে আরম্ভ করলে।

যখন সে গাছের প্রায় গুঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত নেমেছে তখন হঠাৎ নীচে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে সে থম্‌কে দাঁড়াল।

নীচের অন্ধকারে হাঁড়ির মত গলায় কে বল্‌লে,—'গঙ্গারাম, বাতি জ্বাল্‌।'

কিছুক্ষণ পরে একটা ধোঁয়াটে কেরাসিনের লণ্ঠন জ্বল্‌ল। বিনু ছিল মাটি থেকে প্রায় পনেরো হাত উঁচুতে, সে ঘন পাতার আড়াল থেকে গলা বাড়িয়ে দেখ্‌লে, ছ'জন ভীষণ কালো আর ষণ্ডালোক ঠিক তার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মাথায় ঝাঁক্‌ড়া চুল, পরণে হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়, হাতে সড়্‌কি লাঠি। তাদের মধ্যে যে-লোকটা সবচেয়ে জোয়ান আর কালো, তার কোমরে তলোয়ার বাঁধা। তাদের চেহারা দেখেই বিনু বুঝলে,—এরা ডাকাত, ঐ তলোয়ার-বাঁধা লোকটা এদের সর্দ্দার।

গাছের ওপর একজন লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কার্য্য-কলাপ দেখ্‌ছে, এ যদি ডাকাতরা জান্‌তে পারত, তাহলে বিনুর প্রাণের আর কোনো আশা থাকত না, তখনি তাকে কেটে তারা মাটিতে পুঁতে ফেলত। তাই, বিনুর বুকের ভেতর যদিও ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করছিল তবু সে মাটির পুতুলের মতন নিশ্চল হয়ে বসে রইল—একটু নড়্‌লে চড়্‌লে পাছে শব্দ হয়।

ডাকাতের দল লণ্ঠন ঘিরে বসল। সর্দ্দার বললে,—'আমি সব খবর নিয়েছি। দেউড়িতে দু'জন খোট্টা দরোয়ান থাকে; কিন্তু খিড়কির দরজায় কেউ পাহারা দেয় না—বুঝেছিস্‌?'

একজন ডাকাত জিজ্ঞাসা করলে,—'গয়নাগাঁটি কোথায় থাকে?'

সর্দ্দার বললে,—'দোতলার একটা ঘরে। ঘরটা আমি বাইরে থেকে চিনে রেখেছি।—গঙ্গারাম, তামাক সাজ।'

গঙ্গারাম বোধহয় নূতন ডাকাতের দলে ভর্ত্তি হয়েছে—লোকটা ওদের মধ্যে সব চেয়ে রোগা। তার কোমর থেকে একটি ছোট্ট ডাবা হুঁকো ঝুল্‌ছিল, সে সেটা খুলে নিয়ে তামাক সাজতে বস্‌ল। তামাক সাজতে সাজতে বললে,—'কিন্তু সর্দ্দার, শুনেছি জমিদারের বন্দুক আছে—যদি—'

সর্দ্দার বিদ্রূপ করে বললে,—'তোর ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছে? এত প্রাণের ভয় যার সে ডাকাতের দলে ভিড়েছে কেন? তুই যা, ছাগল চরাগে।'

অন্য ডাকাতগুলো হেসে উঠ্‌ল।

গঙ্গারাম মুখে সাহস দেখিয়ে বললে,—'ভয় আমি কাউকে করিনা।—কিন্তু যদি তারা বন্দুক চালায় তখন কি করবে? মালও হাতছাড়া হবে, মাঝ থেকে প্রাণটা যাবে।'

সর্দ্দার তখন বললে,—'সে বন্দোবস্ত কি আমি না করেই এসেছি রে! এই ত্যাখ্‌ যে-ঘরে জমিদারের বন্দুক পিস্তল থাকে সে-ঘরের চাবি চুরি করে এনেছি। দু'দিন যে তার বাড়ীতে বাসন মেজেছি সে কি আর সাধে?'

এই শুনে ডাকাতরা ভারি উৎসাহিত হয়ে উঠল, বললে,—'সাবাস্‌ সর্দ্দার! তোমার সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে। আমাদের সর্দ্দার হবার তুমিই উপযুক্ত লোক।'

সর্দ্দার আরাম করে তামাক টানতে টানতে বললে,—'এই কাজটা যদি মা-কালীর দয়ায় ভালয় ভালয় উৎরে যায়, তাহলে কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল লোটা যাবে—বুঝেছিস? আখেরে আমাদের আর খেটে খেতে হবে না।'

বিন্নু ডালে বসে বসে তাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। তারা যে কার বাড়ীতে ডাকাতি করবার মৎলব আঁটছে তা বুঝতে তার বাকি ছিল না। তার ইচ্ছে হল, কোনোমতে ছুটে গিয়ে যদি খবরটা জমিদার বাবুকে দেওয়া যায় তাহলে এখনো ডাকাতদের ধরা যেতে পারে। কিন্তু গাছ থেকে নাম্‌বার ত উপায় নেই। ঠিক নীচেই ডাকাতগুলো বসে আছে।

ক্রমে রাত্রি গভীর হতে লাগল। বিন্নুর মা নিশ্চয় তার জন্যে ভাব্‌ছেন। হয়ত চারদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেছে। কিন্তু বিন্নুর এই আস্তানাটির কথা ত কেউ জানেনা কাজেই এদিকে কেউ খুঁজতে আস্‌বে না। আহা! যদি আসত তাহলে কী ভালই হত! ডাকাতগুলোও সেইসঙ্গে ধরা পড়ে যেত।

গাছের ডালে নিঃসাড়ে বসে বসে বিন্নুর হাতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেল। কিন্তু তবু ডাকাতদের নড়বার নাম নেই—তারা বসেই আছে। বসে বসে গল্প করছে আর তামাক খাচ্চে।

শেষে যখন রাত্রি দুপুর হতে আর দেরী নেই, তখন সর্দ্দার হুঁকো রেখে উঠে দাঁড়ালো। কোমরে তলোয়ার কষে বললে, 'জোয়ান সব, এবার চল সময় হয়েছে।

গঙ্গারাম, তুই এই গাছতলায় লণ্ঠন নিয়ে বসে থাক। এ জঙ্গলটা ভারি বিশ্রী, পথ হারিয়ে যাবার ভয় আছে। কাজ সেরে ফিরে এসে আমি 'কুক্' দেব তখন তুই লণ্ঠন তুলে নাড়বি—তাহলে আমরা বুঝতে পারব তুই কোথায় আছিস্। এই গাছ তলায় ফিরে এসে আমরা মাল ভাগ-বাটোয়ারা করব-বুঝ্‌লি ?'

গঙ্গারাম ভয় পেয়ে বললে,—'আমি একলা থাক্‌ব ? কিন্তু যদি—যদি—'তার গলা কাঁপতে লাগ্‌ল।

সর্দ্দার তাকে ধমক দিয়ে বললে,-'ভয় কিসের ? বাঘ ভাল্লুক তোকে খেয়ে ফেলবে না, এ বনে শেয়াল ছাড়া আর কোনো জানোয়ার নেই।'

গঙ্গারাম বললে, 'বাঘ-ভালুক নয়—কিন্তু যদি—যদি তেনারা-রাত্তিরে যাঁদের নাম করতে নেই—'

সর্দ্দার হো হো করে হেসে উঠে বললে,-'ও—ভূত। তা যদি ভূতের ভয় করে, রামনাম করিস্।'

তারপর 'জয় মা কালী' বলে ডাকাতের দল অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। গঙ্গারাম লণ্ঠনটি দু'হাঁটুর মধ্যে নিয়ে উপু হয়ে বসে রইল আর ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

হঠাৎ গুরুতর বিপদে পড়লে অনেকের বুদ্ধি লোপ

হয়ে যায়! আবার কেউ কেউ আছে, বিপদ যত ঘিরে ধরে তাদের বুদ্ধিও তত পরিস্কার হয়। ডাকাতরা যখন গঙ্গারামকে রেখে চলে গেল, তখন বিন্নুর মাথায় একটা চমৎকার মৎলব খেলে গেল। কি করে ডাকাতদের জব্দ করা যেতে পারে, তার প্ল্যান সে পরিস্কার চোখের সাম্‌নে দেখতে পেলে।

ডাকাতরা চলে যাবার পর আধঘণ্টা কেটে গেল। তখন বিন্নু গাছের ওপর একটু নড়ে-চড়ে বসল। খড়্‌খড়্‌ শব্দ শুনেই গঙ্গারাম সভয়ে একবার ওপর দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বল্‌তে লাগল,-'রাম রাম রাম রাম—'

এম্‌নি ভাবে দশ মিনিট 'রাম'নাম জপ করবার পর গঙ্গারাম যেই থেমেছে, অমনি পাতাসুদ্ধ অশ্বত্থগাছের একটি ছোট ডাল তার সুমুখে পড়ল।

গঙ্গারাম আঁৎকে উঠে আরো জোরে রাম নাম করতে লাগল আর চম্‌কে চম্‌কে চারদিকে তাকাতে লাগ্‌ল।

বিন্নু দেখলে গঙ্গারামের অবস্থা শোচনীয় হয়ে এসেছে; সে তখন নাকি সুরে গাছের ওপর থেকে বললে—'কোঁ-'

গঙ্গারাম আর পারলে না, 'বাবাগো' বলে চীৎকার করে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড় মারলে। এ জঙ্গলের মধ্যে সে যে আর আসবেনা তাতে কোনো সন্দেহ রইল না।

বিন্নু তখন হাত-পা ছড়িয়ে শরীরটাকে ঠিক করে নিলে কিন্তু গাছ থেকে নামল না।

প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে যাবার পর বিন্নু দূর থেকে সর্দ্দারের 'কুক্' শুনতে পেলে—একটা অনৈসর্গিক দীর্ঘ হুঙ্কার। সে তৈরী হয়ে ছিল, চট্ করে নেমে এল। নিজের ধুতির পাড় আগেই ছিঁড়ে রেখেছিল, তাইতে লণ্ঠনের হাতলটা বেঁধে গাছের একটা নীচু ডালে ঝুলিয়ে দিলে। তারপর লণ্ঠনটাকে বেশ একটা দোলা দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

খানিক পরে ডাকাতের দল এসে পৌঁছুল। সর্দ্দারের পিঠে একটা শাদা কাপড়ের পোঁটলা। আনন্দে তাদের চোখ বাঘের চোখের মত জ্বল্‌ছে।

লণ্ঠনটা গাছ থেকে ঝুলছে দেখে সকলে একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল,-'একি গঙ্গারাম কোথায়!'

সর্দ্দার বললে,—'নিশ্চয় কাছাকাছি কোথায় গেছে। লণ্ঠনটা এখনো দুলছে দেখছ না?'

তখন সকলে গঙ্গারামের জন্যে অপেক্ষা করতে বসল. অনেকক্ষণ কেটে গেল; কিন্তু গঙ্গারামের দেখা নেই। সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল, তারা লুঠের মাল ভাগ করে নিয়ে সরে পড়তে চায়—কারণ ভোর হ'লে আর
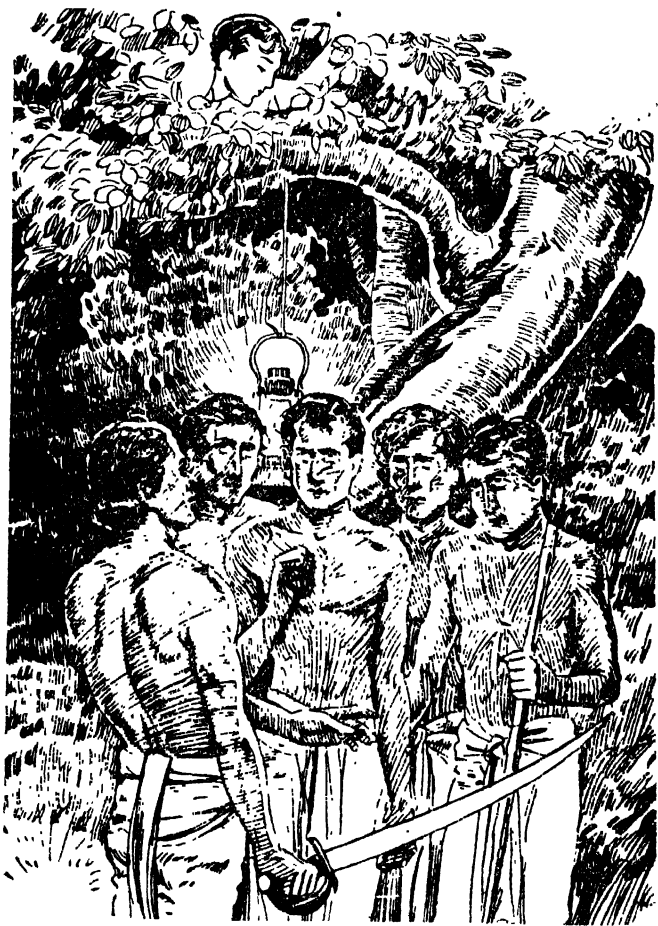
"যদি কেউ হাত দাও—"

এ জঙ্গলে থাকা নিরাপদ হবে না। সর্দ্দার অধীর হয়ে বললে,—'তাইত! গঙ্গারামটা গেল কোথায়?'

সে মুখের মধ্যে আঙ্গুল পূরে একরকম লম্বা শিষ দিল; তারপর কাণখাড়া করে বসে রইল কিন্তু গঙ্গারামের শিষ শুনতে পেলেনা।

শেষে অধৈর্য্য হয়ে একজন ডাকাত বলে উঠল,—'সর্দ্দার, গঙ্গারামের জন্যে বসে থেকে কাজ নেই, এদিকে ভোর হয়ে আসছে। এস, আমরা পাঁচজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে যে-যার সরে পড়ি।'

সর্দ্দার বড় বড় লাল চোখ দুটো তার দিকে ফিরিয়ে বললে,—'আমার দলে ওসব দাগাবাজি চলবে না। মা কালীর পা ছুঁয়ে একাজে নেমেছি, দিব্যি গেলেছি কখনো স্যাঙাতের সঙ্গে দাগাবাজি করব না। মাল চুল চিরে সাত ভাগ হবে। দুভাগ আমি নেব, বাকী পাঁচভাগ তোমরা পাঁচজনে নেবে। গঙ্গারাম একাজে যখন আমাদের সঙ্গে আছে তখন তাকেও তার বখ্রা দিতে হবে।'

একজন বললে,—'সে ত ভালকথা। কিন্তু গঙ্গারাম যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কি হবে?'

সর্দ্দার উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—'চল, আমরা পাঁচজন পাঁচদিকে গঙ্গারামকে খুঁজি গিয়ে। আধঘণ্টার মধ্যে যদি

তাকে খুঁজে না পাওয়া যায়, তখন আমরা আবার এখানে ফিরে আসব। তারপর আমরা ক'জনেই মাল বখরা করে নেব। কি বল ?'

ডাকাতরা সবাই সায় দিলে।

সর্দ্দার তখন বললে,—'এই পোঁটলা এখানে এই আলোর তলায় রইল। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কেউ এতে হাত দেবেনা। যদি কেউ হাত দাও—তাহলে—' বলে প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার তাকালে। সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টির মানে বুঝতে কারুর কষ্ট হল না।

তারপর পাঁচজনে পাঁচদিকে বেরিয়ে গেল। বিন্নু যখন দেখলে তারা অনেক দূরে চলে গেছে তখন সে পা টিপে টিপে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর, পুঁটলিটা কাঁধে করে কাঠ-বেরালীর মত গাছে উঠতে আরম্ভ করলে।

দশ মিনিটের মধ্যে পুঁটলি নিজের দোলার মধ্যে লুকিয়ে রেখে বিন্নু আবার নীচে নেমে এল। যাক, লুঠের মাল ত হস্তগত হয়েছে, এবার ডাকাতদের ধরা চাই।

আধঘণ্টা শেষ হতে আর দেরী নেই, এখনি ডাকাতের দল ফিরে আসবে। বিন্নু অন্ধকারে ছায়ার মতন কালী মন্দিরের দিকে মিলিয়ে গেল।

ডাকাতরা সবাই প্রায় একসঙ্গেই ফিরে এল। দেখলে বোঁচকা নেই।

সর্দ্দার গর্জ্জন করে উঠল,—'বোঁচকা কোথায় গেল?'

কারুর মুখে কথা নেই। সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। সকলের চোখেই সন্দেহের ছায়া। এ ভাবছে ও নিয়েছে, ও ভাবছে এ নিয়েছে।

সর্দ্দার তলোয়ার বার করে ভীষণস্বরে বললে,—'কে সরিয়েছ এখনো বল, নইলে আজ সকলের মাথা এখানে কেটে রেখে যাব।'

ডাকাতরাও সড়কি-ছোরা বাগিয়ে দাঁড়াল। একজন বললে,—'সর্দ্দার, এ তোমার কাজ। তুমিই মাল এখানে রেখে গঙ্গারামকে খুঁজতে যাবার ফন্দি বার করেছিলে।'

সর্দ্দার বললে,—'ওরে মুখ্যু, আমি নিলে কি আর ফিরে আসতুম? এ তোদের কারুর কাজ।'

ডাকাতদের মধ্যে লড়াই বাধে আর কি, এমন সময় তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল,—'বুঝেছি—বুঝেছি—এ গঙ্গারামের কাজ।'

সকলে অস্ত্র নামালে। সর্দ্দার একটু ভেবে বললে, 'তা হতে পারে। গঙ্গারাম হয়ত কাছেই লুকিয়ে ছিল; আমাদের ডাকাডাকিতে ইচ্ছে করেই সাড়া দেয়নি।

তারপর যেই আমরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি অমনি—।
উঃ! গঙ্গারামটা এমন নেমক্‌হারামী করলে।’

ঠিক এই সময় ঠুং করে কালীমন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠেই থেমে গেল, যেন অসাবধানে বেজে ওঠার পর কে ঘণ্টাটা হাত দিয়ে চেপে ধরলে।

ডাকাতরা উত্তেজিতভাবে পরস্পর মুখের পানে তাকাতে লাগল। তারপর সর্দ্দার চাপা গলায় বললে—‘গঙ্গারাম! কালীমন্দিরে লুকিয়েছে। আস্তে আমার পেছনে এস।’

ডাকাতরা হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ধরে ব্যাধের মত নিঃশব্দে মন্দিরের দিকে চলল।

বিনু মন্দিরের চাতালের আড়ালে হাঁটুগেড়ে লুকিয়ে বসে ছিল, যখন দেখলে পাঁচটা অন্ধকার মূর্ত্তি পা টিপে টিপে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল, তখন সে বিদ্যুতের মত এসে প্রাণপণ জোরে মন্দিরের লোহার দরজাটা টেনে কড়াৎ করে বাইরে থেকে শিকল লাগিয়ে দিলে।

তারপর সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে উঠি-কি-পড়ি করে সে গ্রামের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলে। কাঁটায় হাত পা ছড়ে গেল, কাপড় ছিঁড়ে গেল, কিন্তু সেদিকে দৃকপাতও করলে না! গ্রামের সীমানায় যখন এসে

পৌঁছুলো তখন পূব আকাশে একটুখানি দিনের আলো দেখা দিয়েছে।

* * * *

বেলা দশটার সময় জমিদার ভূপতিবাবুর বৈঠকখানায় মস্ত সভা বসেছিল। গাঁসুদ্ধ লোক সেখানে হাজির ছিলেন। এমনকি বিনুর বাবা হারাণ হালদারও বাদ পড়েন নি।

ডাকাতেরা গতরাত্রে যেসমস্ত জিনিষ লুঠে নিয়ে গিয়েছিল সবই পাওয়া গেছে; পুঁটলির মধ্যেই ছিল। ডাকাতদের কালীমন্দির থেকে বার করে পুলিস থানায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। উপস্থিত সবাই বসে বিনুর গল্প শুনছিল—কি করে সে ডাকাত ধরলে। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, কারুর মুখে একটি কথা নেই।

বিনুর গল্প শেস হবার পর খানিকক্ষণ বৈঠকখানা নীরব হয়ে রইল। তারপর জমিদার ভূপতিবাবু বিনুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—'বাবা, তুমি আজ যে সাহস আর বুদ্ধি দেখিয়েছ, গল্পের বইয়েও সেরকম পড়া যায় না। আর আমার যে উপকার করেছ সে ত জীবনে ভোল্‌বার নয়। কাল আমি তোমার প্রতি বড় অবিচার করেছিলুম, তোমার বাবার ওপর রাগ করে তোমাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলুম। ভগবান তাই আমাকে

ভালরকম শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার বাবা আমার সঙ্গে যত ইচ্ছে মামলা করুন কিন্তু আজ থেকে তোমার সমস্ত লেখাপড়ার ভার আমি নিলুম। তুমি যতদিন পড়বে— বি-এ, এম্-এ পাশ করে যদি তুমি বিলেত যেতে চাও সে খরচও আমি যোগাব। তোমার মত রত্ন যদি পয়সার অভাবে পড়াশুনো করতে না পায় তাহলে আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বিদ্বান হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।'

জমিদারবাবুর কথা শুনে সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠলেন। বিন্নু কৃতজ্ঞতাভরা বুকে তাঁর পায়ের ধূলা মাথায় নিলে।

যাত্রী

প্রায় একশ বছর আগেকার কথা।

সন্ধ্যে হয়-হয়; পশ্চিম আকাশে তখনো সোনালী আলো ঝিক্‌মিক্ করছে, কিন্তু মাটির ওপর অন্ধকার নেমে এসেছে। গাছপালার চেহারা কালো আর অস্পষ্টই হয়ে আসছে। দু' একটা পাখী—যাদের বাসায় ফিরতে দেরী হয়ে গেছে,—তারা অস্ফুট আশঙ্কায় কিচ্‌মিচ্ করে ডাক্‌তে ডাক্‌তে দ্রুত পাখা নেড়ে উড়ে চলেছে।

একজন পথিক মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্চে—তার অবস্থাও অনেকটা ঐ বিলম্বিত পাখীর মতন। ভোর থেকে সে হাঁট্‌ছে কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত একটা গ্রামে পৌঁছুতে পারলে না। যে-মাঠের ওপর দিয়ে সে চলেছে সে-মাঠের ঘাসের ওপর মানুষের পদচিহ্ন-আঁকা সরু পথ নেই—শেষ পর্য্যন্ত মানুষের আস্তানায় পৌঁছুতে পারবে কিনা তাও অনিশ্চিত। তবু সে আশায় ভর করে চলেছে - যদি রাত্রির গাঢ় অন্ধকার নেমে আসবার আগে কোনো একটা পল্লীতে গিয়ে উঠ্‌তে পারে।

যাত্রী

পথিকের বেশভূষা অত্যন্ত সাধারণ—সে চাক্‌রী খুঁজতে বেরিয়েছে। তার বাড়ী পশ্চিম বাংলায়, কিন্তু এগারো দিন হেঁটে হেঁটে সে যে কোথায় এসে হাজির হয়েছে তা সে নিজেই জানেনা। কাল একটি ছোট্ট গ্রামে রাত্রি কাটিয়ে আজ ভোর হতে না হতেই সে বেরিয়েছিল—কিন্তু সমস্ত দিন চলেও কোথাও একটি গ্রাম পায়নি। দুপুরে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে নিজের পুঁটলিতে যেটুকু শুকনো চিঁড়ে বাঁধা ছিল তাই খেয়েছিল। তারপর লাঠির ডগায় পুঁটলি বেঁধে লাঠি কাঁধে ক'রে আবার যাত্রা করেছে। কিন্তু পথ তার এখনো শেষ হয়নি।

সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে পথিক এক সময় ডান দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলে—খানিক দূরে কতকগুলো গাছপালার আড়ালে একটা জায়গা চক্‌চক্‌ করছে। পথিক দাঁড়িয়ে পড়ল, সন্ধ্যার আবছায়ায় তার মনে হল যেন একটা মস্ত দীঘি। তেষ্টায় তার বুক পর্য্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিল, সে আর দ্বিধা না করে পা চালিয়ে সেই দিকে চলল। মনে মনে বল্‌লে দীঘি যদি হয় তাহলে নিশ্চয় কাছে গ্রাম আছে। যাক্‌—ঠিক সময়েই আশ্রয় পেয়েছি।

আরো কিছু দূর এগিয়ে সে দেখলে,—হ্যাঁ, দীঘিই

বটে। প্রকাণ্ড দীঘি ; এপার থেকে ওপারের বাঁধানো ঘাট ভাল দেখা যায়না।

দীঘির কিনারায় বসে পথিক অঞ্জলি ভরে ভরে জল খেলে ; চোখে মুখে জল দিয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। দিনের আলো তখন আরো ক্ষীণ হয়ে এসেছে —দীঘির ওপার পর্য্যন্ত ভাল নজর চলেনা—তবু, তার মনে হল, দীঘির ঘাটের ওপর একটি শাদা কাপড় পরা মেয়ে কলসী ভরে জল নিয়ে উঠে চলে গেল। পথিক তখন নিশ্চিন্ত হল যে কাছে নিশ্চয় গ্রাম আছে। সে তাড়াতাড়ি লাঠি কাঁধে ফেলে যেদিকে ঐ মেয়েটি গোধূলির আঁধারে মিশিয়ে গেল সেই দিকে চলতে আরম্ভ করলে।

দীঘির অপর পারে পৌঁছে সে দেখলে—সামনেই একসারি বাবলা গাছ, আর তার ফাঁক দিয়ে এক মস্ত গ্রামের অনেক চালা ঘর দেখা যাচ্ছে।

পথিকের তখন ক্ষুধায় ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন ; তাই সে ভাল করে সব দিক লক্ষ্য না করেই সেই দিকে ছুটে চলল। যদি ভাল করে লক্ষ্য করত তাহলে দেখতে পেত যে, মেটে বাড়ীগুলির দেয়াল অনেক জায়গায় ধ্বসে গেছে, ওপরে খড়ের চাল রোদ বৃষ্টিতে খসে পড়েছে—যেন কতকাল এসব বাড়ীতে কেউ বাস করেনি। সমস্ত গ্রামটা যে শূন্য

ঠিক চমকে উঠ্‌ল—বীরগাঁ!”

খাঁ খাঁ করছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায় তবু একটা বাড়ীতেও প্রদীপ জ্বলছে না—এসব কিছুই সে লক্ষ্য করলে না।

গ্রামের সদর রাস্তা দিয়ে ঢুকেই সে দেখলে সামনে একটা বড় খোড়ো বাড়ী। সে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলে। জীর্ণ দরজা নড়্‌বড়্ করে উঠ্‌ল কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তখন সে হাঁক দিয়ে বল্‌লে, —'কে আছ—একবার বাইরে এস।'

তবু সাড়া নেই। পথিক একটু আশ্চর্য্য হয়ে ভাব্‌লে, —তাইত বাড়ীতে কেউ নেই নাকি?

তখন সে দরজায় জোরে একটা ধাক্কা দিলে—সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। কিন্তু তবু কোনো মানুষের পায়ের শব্দ কি গলার আওয়াজ পাওয়া গেল না। পথিক একটু ইতস্তত করে, মাটিতে লাঠি ঠুকে গলা খাঁকাড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকল।

ভেতরে ঢুকেই সে একেবারে অবাক হয়ে গেল। এ কি! বাড়ীর উঠানে হাঁটু পর্য্যন্ত কাঁটাগাছ আর আগাছার জঙ্গল; ওদিকের ঘরগুলো সব অন্ধকার। পথিকের হঠাৎ গা ছমছম করে উঠ্‌ল। এ বাড়ীতে কি কেউ থাকে না? পোড়োবাড়ী!

সে সাহসে ভর করে আর একবার ডাক দিলে—'বাড়ীতে কেউ আছো?'

এইবার তার প্রশ্নের জবাব এল। ওদিকের অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে কে যেন মেয়েলি গলায় বল্‌লে,—'কে গা তুমি?'

পথিকের আবার সাহস হল,—যাক্, তাহলে বাড়ীতে লোক আছে। সে বিনীত ভাবে বল্‌লে,—'মা, আমি, যাত্রী, অনেক দূর থেকে আসছি। আজ রাত্তিরের জন্যে আমাকে থাকতে দিতে পারবে?'

ওদিক থেকে জবাব এল,—'পারব। তুমি বোসো।'

কোথা বসবে—চারদিকে জঙ্গল—পথিক এদিক ওদিক তাকাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ দেখলে তার ঠিক সুমুখে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। এমন আচম্‌কা স্ত্রীলোকটি এসে উপস্থিত হল যে পথিকের মনে হল যেন ভোজবাজি। স্ত্রীলোকটির মুখ সে দেখ্‌তে পেলেনা, কারণ, মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিল। সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে,—'মা, তোমাদের পুরুষরা কোথায়? তাদের ত কাউকে দেখছি না।'

স্ত্রীলোকটি ঘোমটার ভেতর থেকে বল্‌লে,—'পুরুষ কেউ নেই। তুমি এস।'

স্ত্রীলোকটির পেছন পেছন পথিক দাওয়ার ওপর

উঠ্‌ল। দাওয়াটি বেশ পরিষ্কার, সে পুঁট্‌লি নামিয়ে খুঁটি ঠেসান দিয়ে বসল। স্ত্রীলোকটি বল্‌লে—'তুমি সমস্ত দিন কিছু খাওনি—নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে। ঘরে ঠাণ্ডা ভাত আছে—খাবে?'

পথিক খুশী হয়ে বললে,—'তাহলে ত ভাল হয়। আবার রেঁধে খেতে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে—সত্যিই বড় ক্ষিদে পেয়েছে।'

ঘোমটা-ঢাকা মেয়েমানুষটি এতক্ষণ তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ছিল, অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। পথিক কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল! তার বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব্‌ করতে লাগল। পোড়োবাড়ীর মধ্যে এ কি অলৌকিক ব্যাপার! সে পালাবে কি না ভাবছে, এমন সময় দূর থেকে আওয়াজ এল,—'চলে যেওনা। তুমি অতিথি—না খেয়ে গেরস্তর বাড়ী থেকে যেতে নেই!'

পথিক আবার বসে পড়ল। তার পাদুটো, এমন কাঁপছিল যে সে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারলে না।

কিছুক্ষণ পরে ভাতের থালা হাতে করে স্ত্রীলোকটি তেমনি আশ্চর্য্য ভাবে তার সাম্‌নে আবির্ভূত হল, থালাখানা তার সুমুখে নামিয়ে রেখে বললে—'খাও।' তারপর দেয়াল ঘেঁষে বস্‌ল।

অন্ধকারে, থালায় কি আছে পথিক কিছুই দেখতে পারছিল না; কম্পিত স্বরে বল্লে—'একটা বাতি নেই কি ?'

জবাব এল,—'বাড়ীতে তেল নেই।'

ভয়ে পথিকের গলা বুঁজে এসেছিল, তবু সে, থালায় যা ছিল তাই তুলে মুখে দিতে লাগল। কিন্তু কি যে খাচ্চে তা বুঝ্‌তে পারলে না।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। পথিক কলের পুতুলের মত খেয়ে যাচ্চে, কিন্তু তার সমস্ত অন্তরাত্মা পড়ে আছে ঐ কাপড়-ঢাকা স্ত্রীলোকটির দিকে। তাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না, মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্চে হয়ত বা আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। শেষে আর নীরবতা সহ্য করতে না পেরে সে বলে উঠ্‌ল,—'এ গ্রামের নাম কি ?'

'বীর গাঁ।'

পথিক চম্‌কে উঠ্‌ল—বীরগাঁ! তার মনে পড়ে গেল, কাল রাত্রে আগের গ্রামে সে শুনেছিল যে এ অঞ্চলে বীরগাঁ বলে এক মস্ত গ্রাম ছিল, পাঁচ বছর আগে প্লেগ-মহামারীতে একেবারে শূন্য হয়ে গেছে—সেই থেকে সেখানে আর মানুষ বাস করেনা। এই সেই বীরগাঁ!

হঠাৎ প্রশ্ন হল,—'আর কিছু চাই ?'

'না-না' বলে পথিক ওঠবার উপক্রম করলে।

অন্ধকার থেকে আবার আওয়াজ এল,—'উঠো না। তোমার এখনো পেট ভরেনি। শুধু নুণ দিয়ে পান্তাভাত কি খাওয়া যায়? তোমাকে একটা নেবু এনে দি-কেমন? গাছেই আছে।'

পথিক কোনো জবাব দিতে পারলে না। কিন্তু তার পরই যে ব্যাপার ঘট্‌ল তাতে তার মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে উঠ্‌ল। আব্‌ছায়া অন্ধকারে সে দেখলে, একটা হাত লম্বা হয়ে ঠিক তার কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল. উঠোনের এক কোণে প্রায় বিশ হাত দূরে একটা পাতি নেবুর গাছ ছিল. সেই গাছ থেকে নেবু পেড়ে আবার ফিরে এল

'এই নাও নেবু!'

'বাবাগো' বলে পথিক দাওয়ার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল, তারপর উঠি-কি-পড়ি করে ছুটতে আরম্ভ করলে তার পুঁটলি আর লাঠি সেখানেই পড়ে রইল।

ক্ষীণ একটা স্বর সে শুনতে পেলে,—'যেওনা-যেওনা'

পথিকের তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নেই, সে রাস্তায় বেরিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে উদ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল: রাস্তার দু'ধারের বাড়ীগুলো অস্পষ্ট ভাবে তার পাশ দিয়ে

সরে যেতে লাগল—কোনোটা ভেঙে পড়েছে, কোনোটা অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোথাও একটি জীবন্ত প্রাণীর সাড়া নেই—যেন পরিত্যক্ত মশান।

তখন রাত্রি গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে—আকাশে চাঁদ নেই—কেবল কয়েকটা নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে। পথিক হোঁচট্ খেয়ে ছ'বার পড়ে গেল, কিন্তু তার গতি হ্রাস হলনা ; গড়াতে গড়াতে উঠে আবার দৌড়ুতে লাগল। তার মনে হতে লাগল যেন সেই শাদা কাপড় পরা মূর্ত্তিটা এখনো তার পেছনে ছুটে আস্‌ছে, এখনি লম্বা হাত বাড়িয়ে তার গলা টিপে ধরবে।

এম্‌নি ভাবে অনেকক্ষণ দৌড়োবার পর পথিক গ্রাম পেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছুল। চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না—কাণ ভোঁ ভোঁ করছিল, বুকের ভেতর ছুম্‌ছুম্ করে মুগুরের ঘা পড়ছিল, যেন এইবার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে। সে তৃতীয় বার হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু আর তার উঠে পালাবার শক্তি ছিল না—সে কিছুক্ষণ মাঠের মাঝখানে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইল।

এইভাবে পড়ে থেকে হৃৎপিণ্ডের উন্মত্ত স্পন্দন যখন একটু কমে এসেছে তখন সে মুখ তুলে আস্তে আস্তে উঠে বস্‌ল। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, আল্‌কাৎরা মাখানো

দেয়ালের মত তাকে ঘিরে আছে—কোনো দিকে কিছু দেখা যায়না। এমন কি, যে-গ্রাম ছেড়ে সে পালিয়ে এসেছে সেগ্রাম তার পিছনে কি সুমুখে কি পাশে তাও সে আন্দাজ করতে পারলে না।

কিন্তু এই জনমানবশূন্য দেশে ঘুটঘুটে কালো মাঠের মাঝখানে মানুষ কতক্ষণ একলা বসে থাকতে পারে? পথিক টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়ালো। হাঁটুদুটো তার ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু তবু এই ভয়ঙ্কর জায়গা ছেড়ে তাকে পালাতেই হবে। একটা দিক ঠিক করে সে যতদূর সম্ভব দ্রুত চলতে লাগল।

কিন্তু বেশীদূর তাকে যেতে হলনা। পাঁচ মিনিট চলবার পরই সে মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেলে—যেন কাছেই কোথাও অনেকগুলো লোক একসঙ্গে বসে জটলা করে গল্প করছে।

তাদের গলার আওয়াজ ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট। পথিকের মন আশায় ভরে উঠ্‌ল, সে ভাবলে, দৌড়ুতে দৌড়ুতে নিশ্চয় কোনো লোকালয়ের কাছে এসে পড়েছে। সে আগ্রহভরে কাণ খাড়া করে সেই শব্দ যেদিক থেকে আসছিল সেইদিকে চলতে লাগল।

শব্দের দিকেই তার লক্ষ্য ছিল; তাই তার পথ যে

ক্রমে ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে চলেছে তা সে খেয়াল করলে না। ছোট ছোট বাব্‌লার ঝোপে তার গা ছড়ে যেতে লাগল, পায়ে কাঁটা বিঁধ্‌তে লাগল—তাও সে অগ্রাহ্য করে শুধু শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে চলল!

ক্রমশঃ একটা স্যাঁৎসেঁতে উদ্ভিদ-পচা গন্ধ তার নাকে আসতে লাগল, একটা ভিজে নিশ্বাস-রোধকর বাতাস তার গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। এদিকে পায়ের নীচে মাটিও ক্রমে নরম তল্‌তলে হয়ে আসছে,—চলতে গিয়ে পা বসে যাচ্চে; যেন দুর্গন্ধ পাঁকে ভরা জলার দিকেই সে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু যতই এগিয়ে চলেছে মানুষের গলার আওয়াজ ততই স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে। পথিক ভাবছে, এই কাদাটুকু পেরিয়ে যেতে পারলেই সে মানুষের আস্তানায় পৌঁছুবে।

হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে সে এক বাব্‌লার ঝোপের আড়ালে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক তার সামনে, প্রায় দশ হাত দূরে, একটা আলোর গোলা মাটি থেকে উঠে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। তারই নীল আলোতে পথিক নিমেষের জন্যে সমস্ত দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেলে। একটা পাঁকে-ভরা কুণ্ডের মাঝখান থেকে ঐ

আগুনের পিণ্ডটা উঠ্‌ছে ; আর সেই কুণ্ড ঘিরে অনেকগুলো মূর্ত্তি গোল হয়ে বসে আছে।

পথিকের গায়ের রক্ত হীম হ'য়ে গেল। এ যে আলেয়া! তবে কি সে শ্মশানে এসে পড়েছে? শ্মশানেই ত আলেয়া জ্বলে। আর, ঐ যে মূর্ত্তিগুলো বসে আছে—ওরা কারা? মানুষ? কিন্তু মানুষ এই রাত্রে আলেয়া ঘিরে বসে থাকবে কেন? ওদের চেহারা সে ভাল করে দেখতে পায়নি—কিন্তু যেটুকু দেখেছিল—

এই সময় আর একবার আলেয়ার নীল আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। এবার পথিক তাদের ভাল করে দেখ্‌তে পেল।—মানুষ নয়—তারা মানুষ নয়, শুধু একপাল আস্ত কঙ্কাল ; তাদের গায়ে মুখে কোথাও এতটুকু মাংস নেই।

পথিকের আর চীৎকার করবারও ক্ষমতা ছিল না। সে পিছু ফিরে পালাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু—

তার কাপড় বাব্‌লার ডালে আট্‌কে গিয়েছিল ; যেম্‌নি পালাতে গেল অমনি কাপড়ে টান পড়ল, যেন কে তাকে পিছন থেকে টেনে ধরছে।

পথিকের মুখ দিয়ে কেবল একটা চাপা গোঙানি বার হল ; সে কাদার ওপর মুখ গুঁজে পড়ে গেল।

'মানুষ নয়...এক পাল কঙ্কাল!'

তারপর সব স্থির।

* * * *

হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে পথিক দেখলে, সেও সেই আলেয়া-কুণ্ডের ধারে বসে আছে। তার মনে আর একটুও ভয় নেই।

আবার আলেয়া জ্বলে উঠ্‌ল। যারা কুণ্ড ঘিরে বসে ছিল তারা নড়ে-চড়ে বসল। তাদের হাড়গুলো খট্ খট্ করে উঠ্‌ল।

পথিকের পাশে যে কঙ্কালটা বসেছিল সে ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করলে,—'কি হে, তুমি কতক্ষণ এলে?'

পথিক কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না—যেন ইতিপূর্ব্বে কি হয়েছে তা সে মনে করতে পারছে না। এদিক-ওদিক তাকাকে তাকাতে অদূরে বাব্‌লা গাছের একটা ঝোপ সে দেখতে পেলে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে, ঝোপের নীচে একটা তাজা মড়া ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে।

তখন সে সব বুঝতে পারলে।

ফিরে এসে বললে,—'আমি এইমাত্র আসছি।'

কঙ্কালটা বল্‌লে,—'বেশ বেশ। ঐখানে অনেক কঙ্কাল পড়ে আছে—তারই একটার মধ্যে ঢুকে পড়। তোমার

নিজের কঙ্কাল তৈরী হতে এখনো ঢের দেরী। যতদিন মাংস পচে হাড় না বেরোয় ততদিন ধারেই কারবার চালাও।'

অন্য কঙ্কালগুলো একসঙ্গে খল্‌খল্‌ করে হেসে উঠল।

জেনারেল্ ন্যাপলা

খ্যাংরা কাঠির আগায় একটি আলু বিঁধে দিলে যেরকম দেখতে হয়, নেপালের চেহারাটি ছিল ঠিক সেই রকম। ইস্কুল সুদ্ধ ছেলে তাকে প্রথমে ন্যাপ্‌লা বলে ডাকত। কিন্তু পরে সে নাম বদলে গিয়েছিল।

নেপাল ইস্কুলের নীচু ক্লাশে পড়ত, তার বয়স ছিল দশ কি এগারো বছর। কিন্তু ভারি রোগা বলে তার বয়স আরো কম মনে হত। একটা ফড়িংয়ের পায়ে যে জোর আছে, সেটুকু জোরও তার ছিলনা। কিন্তু তবু সে ক্রমে ক্রমে ইস্কুলের ছেলেদের স্নেহ আর সম্মানের পাত্র হয়ে উঠেছিল। কি করে এই হেঁড়ে-মাথা ন্যাল্-ন্যালে ছেলেটা এমন অসাধ্য সাধন করলে ?

হীরু নামে স্কুলে একটা ভারি দুষ্ট ছেলে ছিল ; সে একদিন নেপালের মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলেছিল,—'এই তালপাতার সেপাই, তুই কি ভাত খাস্ না ? অমন কাটির মতন চেহারা কেন ?'

হীরুর গায়ে জোর বেশী ; নেপাল কোনো উত্তর দেয়নি। চাঁটিও বেবাক হজম করে গিয়েছিল। কিন্তু

তার পরদিনই এমন এক ব্যাপার ঘটল যাতে হীরু একেবারে কাবু হয়ে পড়ল।

হীরু মাষ্টারদের চেহারা বর্ণনা করে কবিতা লিখত, আর লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেদের পড়ে শোনাত। সেকেণ্ড মাষ্টার হরিবাবুর মাথায় একগাছিও চুল ছিলনা কিন্তু গোঁফ ছিল প্রকাণ্ড ঝাঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া; তিনি ক্লাশে এসে রোলকল করেই ঘুমিয়ে পড়তেন—ছেলেদের বলতেন, 'এসে' লেখো কিম্বা তর্জ্জমা কর। তারপর ক্লাশের শেষে ছেলেদের খাতা পরীক্ষা করে ঘণ্টা বাজলেই উঠে চলে যেতেন হীরু তাঁর নামেও এক পদ্য লিখেছিল।

সেদিন হরিবাবু ক্লাশে এসেই দেখলেন তাঁর টেবিলের ওপর একটা খাতা পড়ে রয়েছে। খাতায় কারুর নাম লেখা নেই, তিনি পাতা উল্টে দেখলেন তার ভেতর এই কবিতাটি লেখা রয়েছে—

মাষ্টার বাবু হরি ঘোষ
মাথায় টাক কি ভীষণ!
গোঁফ দেখে হয় পরিতোষ
যেন রে সুন্দর-বন।
গোঁফে যদি যেত টাক ঢাকা
কি শোভা হত মরি মরি!

ঘুমুলেই স্থুরু নাক ডাকা
ঘড়র ঘোঁং—হরি হরি !

কবিতা পড়েই হরিবাবু একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন, গর্জ্জন করে বললেন,—'কে লিখেছে এ পদ্য ? শীগগির বল—নইলে ক্লাশ-স্থদ্ধ রাস্টিকেট করব।'

হরিবাবুর মূর্ত্তি দেখে ছেলেরা ভয় পেয়ে গেল। তারা ভয়ে ভয়ে কবিতাটি দেখতে চাইলে কিন্তু তিনি দেখালেন না। জিজ্ঞাসা করলেন,—'এ ক্লাশে কে পদ্য লেখে ?'

সবাই হীরুকে দেখিয়ে দিলে। হীরুর মুখ চূণ হয়ে গেল, তবু সে সাহস করে বললে,—'কি হয়েছে স্থার ?'

হরিবাবু তার চোখের সামনে খাতাটা ধরে বললেন,—'এ পদ্য তুই লিখেছিস্ ?'

হীরু ঢোক গিলে বললে,—'আজ্ঞে স্থার—আমি স্থার—'

'শূয়োর পাজি'—বলে হরিবাবু ঠাস করে তার গালে এক চড় বসালেন, তারপর কাণ ধরে হিড়্ হিড়্ করে টান্তে টান্তে তাকে হেড মাষ্টারের ঘরে নিয়ে গেলেন।

হেড মাষ্টার হীরুকে শাস্তি দিলেন, সাত দিন কাণধরে বেঞ্চিতে দাঁড়াবে, আর, ইস্কুলের সমস্ত ছেলের সামনে তাকে বেত মারা হবে।

নেপাল ভালমানুষের মতন চুপ করে সব দেখলে, শুনলে। কিন্তু সেই পদ্য লেখা খাতাটা হরিবাবুর টেবিলে কে রেখেছিল তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। নেপাল সে ক্লাশের ছেলে নয়, তাই তার ওপর হীরুর সন্দেহ হলেও প্রমাণের অভাবে সে কিছু করতে পারলে না। তাছাড়া, নেপালের কূট বুদ্ধি দেখে ইস্কুলের ছেলেরা সবাই তাকে সমীহ করে চলতে লাগল, সে রোগা বলে তার গায়ে হাত তোলবার সাহস আর কারুর রইল না।

শুধু তাই নয়, মাষ্টারেরাও নেপালের গায়ে হাত দিতে ভয় পেতেন। নেপাল লেখাপড়ায় ভালই ছিল ; কিন্তু তবু বাংলার টীচার বলাইবাবুর হাত থেকে কারুর নিস্তার ছিল না। বলাইবাবু সর্ব্বদাই ছেলেদের ঠেঙাবার ছুতো খুঁজে বেড়াতেন। ক্লাশের যারা ভাল ছেলে তারাও মাঝে মাঝে তাঁর খপ্পরে পড়ে যেত। বলাইবাবু যখন ক্লাশের পড়ায় কোনো ছেলেকে ঠকাতে না পারতেন তখন তাকে অভিধান থেকে শক্ত শক্ত কথা বেছে মানে জিজ্ঞাসা করতেন। কেউ না পারলে অমনি একমুখ হেসে তাকে প্রহার আরম্ভ করতেন।

নেহাৎ রোগা পটকা বলে নেপাল এতদিন বলাই বাবুর নজরে পড়েনি ; কিন্তু একদিন তাঁর শ্যেনদৃষ্টি তার

ওপর গিয়ে পড়ল। তার মাথায় গাঁট্টা মারবার জন্যে বলাইবাবুর হাত নিশ্-পিশ্ করতে লাগল। তিনি তার পড়া জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন।

নেপাল ঠিক ঠিক জবাব দিতে লাগল, একটাও ভুল করলে না। তখন, শিকার ফস্কায় দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন,—'বল, অকুতোভয় মানে কি?'

নেপাল ভারি মুস্কিলে পড়ল। কথাটা সে শুনেছিল বটে কিন্তু ঠিক মানে জানত না। কিন্তু উত্তর না দিলেও রক্ষে নেই, তাই সে একটু ভেবে নিয়ে বললে,—'অকুতোভয় মানে কুকুরকে যে ভয় করেনা।'

বলাইবাবুর মুখে হাসি দেখা দিলে, তিনি বললেন, 'হুঁ ঠিক বলেছিস্। এদিকে আয়।'

নেপাল তাঁর চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি যেন ভারি আদর করে তার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে মুঠি শক্ত করে বললেন, 'খাসা ছেলে! সোনার চাঁদ ছেলে! এবার তোকে একটা সোনার মেডেল দেব।' বলে চুল ধরে নাড়া দিলেন।

কারুর বুঝতে বাকি রইলনা যে বলাইবাবু আজ নেপালকে বাগে পেয়েছেন, সহজে ছাড়বেন না। বেড়াল যেমন আধমরা ইঁদুর নিয়ে খেলা করে তিনি তেমনি তাকে

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক গাঁট্টা !

নিয়ে খেলা করছেন। নেপাল কিন্তু গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে রইল, যেন কিছুই বুঝতে পারে নি। চুলে তার বিষম লাগছিল, কিন্তু সে একটু মুখবিকৃতি পর্যান্ত করলে না।

বলাইবাবু মধু-ঢালা সুরে বললেন, 'আচ্ছা, এবার বলত নেপাল,. 'ইরম্মদ' মানে কি ?'

ইরম্মদ শব্দের মানেও নেপাল জানত না ; কিন্তু সে ঠক্‌বার পাত্র নয়, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'ইরম্মদ মানে ইরাণ দেশের মদ।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক গাঁট্টা ! নেপালের মাথাটি আর একটু হলেই মেটে হাঁড়ির মতন ফুটো হয়ে যেত। বলাই বাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন,—'তবে রে পাজি, এই বিদ্যে হয়েছে ? ইরাণ দেশের মদ ! আমার সঙ্গে ঠাট্টা। দাঁড়াও আজ তোমার ইরাণ দেশের মদ বার করছি।' এই বলে আর একটি গাঁট্টা মারলেন। ঠকাস্‌ করে শব্দ হল।

নেপাল দ্বিতীয় গাঁট্টা খেয়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ল, দু'বার গোঁ গোঁ শব্দ করলে, তারপর চুপ।

বলাইবাবু ক্ষাণিকক্ষণ চড় বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু যখন দেখলেন নেপাল অনড় হয়ে পড়ে আছে, ওঠবার নাম নেই, তখন তাঁর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। তিনি বললেন,—'এই ন্যাপ্‌লা-ওঠ্‌।'

নেপাল নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছে, নড়ন-চড়ন নেই। ক্লাশের ছেলেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, একজন বললে, 'স্যার, বোধহয় মরে গেছে।'

বলাইবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'মরবে কি ? গাঁট্টা খেলে কেউ কখনো মরে ?'

একটা ছেলে সে কিছুক্ষণ আগেই গাঁট্টা খেয়েছিল, বললে, 'ও নিশ্চয় মরে গেছে। আপনার গাঁট্টা কি সহজ স্যার, ওর মাথার খুলি ছেঁদা হয়ে গেছে।'

বলাইবাবু একেবারে শাদা হয়ে গেলেন। নেপাল উপুড় হয়ে পড়েছিল, তাকে চিৎ করে দেখলেন তার চোখ কপালে উঠে গেছে, দাঁতে দাঁত-কপাটি। বলাইবাবু কাঁপতে কাঁপ্তে একটা ছেলেকে বললেন, 'ওরে যা শীগ্গির একঘটি জল নিয়ে আয়।'

ওদিকে আর একটা ছেলে হেড্ মাষ্টারকে খবর দিতে ছুটেছিল। বলাইবাবু কি করেন, নেপালের দাঁতকপাটি ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দাঁতকপাটি কিছুতেই ছাড়ানো যায়না। অনেক কষ্টে নেপালের মুখ একটু হাঁ হল। বলাই বাবু তার মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিলেন।

অম্নি আবার দাঁত-কপাটি ! আর, সে কি ভীষণ দাঁত কপাটি ! বলাইবাবু প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলেন, "ওরে ছাড়্

ছাড়্—ন্যাপ্লা, গেলুম গেলুম—ওরে তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি ছাড়্—'

কিন্তু নেপাল অচৈতন্য—বলাইবাবুর চীৎকার শুনতে পেলেনা। দাঁতকপাটীর ঝোঁকে সে তাঁর আঙুল চিবোতে আরম্ভ করলে।

এমন সময় হেড মাষ্টার মশায় এসে উপস্থিত হলেন নেপালের মাথায় জল ঢালা হতে লাগল; কেউ তাকে বাতাস করতে লাগল। তারপর বহুকষ্টে অনেকক্ষণ পরে নেপালের জ্ঞান হল।

বলাইবাবু যখন তার মুখ থেকে আঙুল বার করলেন তখন আঙুলটা ডাঁটা-চচ্চড়ির সজনে-ডাঁটার মত ছিব্ড়ে হয়ে গেছে।

সেই থেকে বলাইবাবু ছেলেদের গাঁট্টা মারা ছেড়ে দিয়েছেন। অন্য মাষ্টারেরাও কেউ নেপালের গায়ে হাত তোলেন না। কে জানে আবার যদি তার দাঁতকপাটি লাগে? বলা ত যায় না।

কিন্তু আসল গল্পটা এখনো আরম্ভই করা হয়নি. নেপালের নাম কি করে জেনারেল ন্যাপলা হল, তারপর সে কি করে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি খেতাব পেলে সেই কথাই আজ বলব।

শহরে দুটো ইস্কুল ছিল, একটা টাউন ইস্কুল, যাতে নেপাল পড়ত,—আর একটা মিশন ইস্কুল। এই দুই ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি-মারপিট লেগেই থাকত। ফুটবল হকি খেলা নিয়ে তাদের চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই, রাস্তায়, মাঠে গঙ্গার, ধারে কোথাও দু'দল ছেলের দেখা হলেই প্রথমে কথা কাটাকাটি তারপর মারামারি বেধে যেত।

মারামারির জন্যে সর্ব্বদা তৈরী হয়ে দু'পক্ষ রাস্তায় বেরুত; দু'পকেটে ঢিল ভরা থাকত, আর হাতে থাকত বেতের ছড়ি কিম্বা খেজুরের ডাল। দূর থেকে প্রথমে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি চলত, তারপর পকেটের ঢিল ফুরিয়ে গেলে ক্রমশ দুইপক্ষ এগিয়ে এসে ছড়ি চালাতে আরম্ভ করত। তাতেও যদি একপক্ষ পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করত তখন হাতাহাতি, আঁচড়া-আঁচড়ি, কাম্ড়া-কাম্ড়ি করে যুদ্ধের অবসান হত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নেপালের ইস্কুলের ছেলেরা এইসব খণ্ডযুদ্ধে বড় একটা জিততে পারত না—প্রায়ই মার খেয়ে তাদের চম্পট দিতে হত। তার কারণ, মিশন ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে খুব বেশী একতা ছিল, আর ছিল তাদের মধ্যে কতকগুলো সাঁওতাল ক্রিশ্চান ছেলে। তাদের গা এত শক্ত যে তারা ঢিল-কিল গ্রাহ্য করত না, একেবারে

বাঘের মত বিপক্ষদের মধ্যে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিত। যাহোক, সুখের কথা এই যে, বারবার হেরে গিয়েও টাউন ইস্কুলের ছেলেরা দমে যায়নি সমান ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে।

একদিন দুপুর বেলা টিফিনের সময় ছেলেরা ইস্কুলের মাঠে এখানে-ওখানে জটলা পাকাচ্ছে, এমন সময় ফুটবল হাফ্‌ব্যাক সমরেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বাইরে থেকে এসে হাজির হল। সে বাজারে পেন্সিল কিন্‌তে গিয়েছিল, তাকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে সবাই বুঝলে একটা কিছু হয়েছে। সকলে উদগ্রীব হয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল, সে তখন ব্যাপারটা বললে। বাজারে পাঁচজন মিশন ইস্কুলের ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয়; তারা তাকে দেখে একসঙ্গে এতখানি জিভ বার করে ভেংচাতে আরম্ভ করে; সে যেখানে যায় তারাও জিভ বার করে তার পিছন যায়। সমরেশ একা, তারা পাঁচজন, তাই সে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে সাহস করলে না। শেষে দূর থেকে তাদের দু'হাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে 'আজ বিকালে দেখে নেব'—বলে সে দৌড়ে পালিয়ে এসেছে।

গল্প শুনে সকলেরই রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌ল। বাজারের মধ্যে জিভ্‌ বার করে পিছন পিছন ঘুরে বেড়ানোর দারুণ

অবমাননা সকলের মর্ম্মে গিয়ে বিঁধল। দু'চারজন ছেলে তখনই গিয়ে তাদের শাস্তি দেবার জন্যে তৈরী ছিল, কিন্তু এই সময় ঘণ্টা পড়ে যাওয়াতে প্রতিহিংসা সাধন আপাতত মূলতুবি রাখতে হল। স্থির হল, ছুটির পর দেখে নেওয়া যাবে।

ইস্কুলের ছুটির পর যথাসময় দুইপক্ষের দেখা হল—এবং যুদ্ধ সুরু হল। ফল কিন্তু আশানুরূপ হল না। মিশন ইস্কুলের ছেলেরা জিভ্‌ভেংচানোর খবর জান্‌ত, তারা তৈরী হয়ে এসেছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর দেখা গেল, যারা প্রতিহিংসা নিতে গিয়েছিল, তাদের হাতের চেয়ে পা বেশী চল্‌ছে এবং বিশ্বাসঘাতক পাগুলো সেইদিকেই চলছে যেদিকে শত্রু নেই।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা টাউন ইস্কুলের ছেলেরা ভারি মনমরা হয়ে নিজেদের খেলার মাঠে বসেছিল—ফুট্‌বলে লাথি মারবার উৎসাহও ছিলনা। এই দারুণ দুর্দ্দিনে ছোট-বড়র ভেদজ্ঞানও ঘুচে গিয়েছিল, নীচু ক্লাশের ছেলে, উঁচু ক্লাশের ছেলে সবাই বিমর্ষ ভাবে এক জায়গায় বসে নিজেদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা ভাবছিল।

লালুর কপাল ঢিবি হয়ে ফুলে উঠেছিল, সে তাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে উঠ্‌ল,—'আমরা কি একবারও

ওদের হারাতে পারব না? চিরকালই কেবল হেরে মরব ?'

সকলের মনে ওই কথাটাই ঘুরছে, তাই কেউ আর জবাব দিলে না।

সুধা বলে একটি ছেলে সে নেপালের বন্ধু বোধহয় ; সকলকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই বললে, 'সেদিন ন্যাপলা কিন্তু ওদের একটা ছেলেকে খুব জব্দ করেছে।'

গিরীশ ফুটবলের ক্যাপটেন, বয়সেও সকলের চেয়ে বড়, সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি করেছে ন্যাপলা ?'

সুধা বলে উঠল, 'উঃ—সে ভারি মজা। ন্যাপলা করেছে কি, একটা টিনের কৌটোয়—; এই ন্যাপলা, তুই নিজে বল্না।'

নেপাল কাছেই ছিল, গম্ভীরভাবে বললে, 'ইস্কুলে আসবার পথে রোজ ও-ইস্কুলের একটা হুম্‌দো ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হত ; সে আমাকে দেখলেই তাড়া করে মারতে আসত। আমি দৌড়ে পালিয়ে আসতুম। সেদিন একটা টিনের কৌটোয় কতকগুলো জ্যান্ত বোল্‌তা পুরে নিয়ে আসছিলুম, ছেলেটা আমায় তাড়া করলে। আমি কৌটোটা ফেলে পালিয়ে এলুম। সে কৌটো তুলে নিয়ে যেই তার ঢাক্‌নি খুলেছে, অমনি বোলতাগুলো বেরিয়ে

তার মুখে কামড়ে দিলে। দু'মিনিটের মধ্যে তার মুখ ফুলে একেবারে ফুটবল হয়ে গেল।'

সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। গিরীন জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কৌটোয় বোল্‌তা পূরলি কি করে?'

নেপাল যেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—'কেন—কৌটোর তলায় চিনি ছড়িয়ে বোলতার চাকের কাছে রেখে দিয়েছিলুম—তারপর চারপাঁচটা বোল্‌তা যখন চিনি খাবার জন্যে ভেতরে ঢুকল অমনি ঢাক্‌না বন্ধ করে দিলুম।'

সবাই হেসে উঠল। নেপালের বুদ্ধির পরিচয় তারা আগেও কিছু কিছু পেয়েছিল, এখন আবার নূতন করে পেয়ে বেশ খুসী হয়ে উঠল।

গিরীন অনেকক্ষণ নেপালের মুখের দিকে চেয়ে রইল; তারপর বললে,—'ন্যাপলা, তোর ত খুব বুদ্ধি, ওদের হারাবার কোনও ফন্দি বার করতে পারিস্?'

নেপাল তৎক্ষণাৎ বললে,—'পারি। এমন ফন্দি বার করতে পারি যে ওরা হেরে ভূত হয়ে যাবে। আর কক্ষনো আমাদের সঙ্গে লড়তে আসবে না।'

সকলে নেপালকে ঘিরে ধরলে—'কি ফন্দি! কি ফন্দি! ন্যাপলা শীগগির বল্—সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

নেপাল বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে,—'এখন বলব

না, বল্‌লে সবমাটি হয়ে যাবে। গিরীনদা, তোমাদের তিনচার জনকে চুপি চুপি বল্‌তে পারি। আমি মনে মনে সব ঠিক করে রেখেছি।'

'বেশ, সেই ভাল।'

তখনই একটা কমিটি তৈরী হল—তার নাম হল 'সমর-সমিতি।' গিরীন নেপাল লালু সমরেশ—এই চারজন হল সেই সমিতির সভ্য। স্থির হল, এরা যা বলবে সেই মতে সকলকে চলতে হবে—কেউ যদি হুকুম অমান্য করে, তার শাস্তি হবে।

অতঃপর সমর-সমিতির সভ্যরা আড়ালে গিয়ে পরামর্শ করতে বসল। নেপাল তখন তার মৎলব প্রকাশ করে বললে। শুনে সকলে একবাক্যে নেপালকে সেনাপতি নিযুক্ত করলে। তার নাম হল—জেনারেল ন্যাপ্‌লা।

মিশন ইস্কুলের ছেলেরা তাদের মাঠে বসে গল্পগুজব করছিল, এমন সময় সমরেশ একখানা শাদা পতাকা হাতে করে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাদের সেনাপতি কে?'

সমরেশ ফুটবল খেলোয়াড়, তাকে সকলেই চিনত। শাদা পতাকা নিয়ে তাকে এসে দাঁড়াতে দেখে সবাই ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেল ; এরকম ব্যাপার আগে কখনো ঘটেনি।

একজন জিজ্ঞাসা করলে,—'তুমি কোথা থেকে আসছ? কি চাও?'

সমরেশ বললে,-'আমি টাউন স্কুল সমর-সমিতির দূত; তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

মিশন ইস্কুলের ছেলেরা চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিলে-তাদেরও খুব উৎসাহ হল। কিন্তু সেনাপতি ত তাদের কেউ নেই! এতদিন এলো-পাথাড়ি যুদ্ধ চলেছে—সেনাপতি নিযুক্ত করবার কথা তাদের মনেই আসেনি। তারা এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

কিন্তু সেনাপতি যে তাদের নেই একথাও স্বীকার করতে পারেনা। তাদের ফুটবলের ক্যাপ্টেন প্রতাপ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সে এগিয়ে এসে বললে,—'আমি সেনাপতি।'

এই নূতন ধরণের খেলা পেয়ে মিশন ইস্কুলের ছেলেরা ভারি খুশী হয়ে উঠ্ল। এ যেন জার্ম্মানীর সঙ্গে ফরাসীর যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হচ্ছে। দূতকে তারা খুব খাতির করে বসালে—কারণ দূত শুধু অবধ্য নয়, তাকে অসম্মান করাও ঘোর অসভ্যতা।

সমরেশ আর প্রতাপ সাম্না-সাম্নি বসল। প্রতাপ সেনাপতির উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করে বললে,—'শত্রুর দূত, এবার তোমার কি বক্তব্য আছে বল।'

সমরেশ বললে,—'আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করতে এসেছি।'

সেনাপতি প্রতাপ বললে,—'উত্তম কথা। তোমাদের সেনাপতি কে?'

সমরেশ বললে—'আমাদের সেনাপতির নাম জেনারেল হ্যাপ্‌লা।' নেপালকে এরা কেউ চিন্‌ত না, ভাবলে নিশ্চয় খুব জবরদস্ত্‌ সেনাপতি। গায়ে ভীষণ জোর।

সমরেশ বলতে লাগল,—'এখন আমাদের সমর-সমিতির বক্তব্য শোনো। আমাদের আর তোমাদের মধ্যে অনেকদিন ধরে যুদ্ধ চলে আসছে, কিন্তু সে যুদ্ধই নয়—ছেলেখেলা। আমরা চাই, একদিন রীতিমত যুদ্ধ হোক। তোমাদের দলে ত্রিশ জন যোদ্ধা থাকবে, আমাদের দলেও ত্রিশজন থাকবে। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে লড়াই হবে। তারপর এই লড়ায়ে যেপক্ষ হারবে—চিরদিনের জন্যে তাদের হার স্বীকার করে নিতে হবে। তোমরা রাজি আছ?'

সব ছেলে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল,—'রাজি আছি, রাজি আছি।'

সেনাপতি প্রতাপ হাত তুলে বললে,—'তোমরা চুপ কর—সেনাপতিকে বল্‌তে দাও।' তারপর কিছুক্ষণ মুখ ভীষণ গম্ভীর করে ভুরু কুঁচ্‌কে বসে থেকে বললে,—

আমরা, তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত আছি। যুদ্ধ কবে হবে?'

'রবিবার বিকেল তিনটের সময়।'

'আপত্তি নেই। কোথায় যুদ্ধ হবে?'

'আমরা স্থির করেছি, গঙ্গার ধারে পশ্চিম দিকে যে বালির চড়া আছে সেইখানে যুদ্ধ হবে; কারণ সেখানে ওসময় বাইরের লোক কেউ থাকেনা। কিন্তু তোমরা যদি অন্য কোথাও লড়তে চাও আমাদের আপত্তি নেই।'

প্রতাপ বললে,—'না না, চড়াতেই যুদ্ধ হবে—সেই উপযুক্ত স্থান। কিন্তু হারজিৎ কি করে বিচার হবে?'

সমরেশ বললে,—'যুদ্ধ ক্ষেত্রের দুদিকে দুটো কাশের ঝোপ আছে—তাদের মাঝখানে যুদ্ধ হবে। যেদল কাশের সীমানা পার হয়ে পালিয়ে যাবে তাদেরই হার। রাজি আছ?'

প্রতাপ দাঁড়িয়ে উঠে বললে,—'রাজি আছি। রবিবার বেলা তিনটের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্তুত থেকো। হর হর মহাদেও!'

সমরেশও যুদ্ধনিনাদ শিখে এসেছিল, সেও পতাকা তুলে ধরে বললে,—'জয় চামুণ্ডে!'

তারপর সেনাপতিকে ফৌজী কায়দায় স্যালুট্ করে সমরেশ ঝাণ্ডা কাঁধে করে চলে গেল।

টিকি-মেধ

দু'দিকে সমরসজ্জা চল্‌তে লাগল। মিশন ইস্কুলে বাছাই করে ত্রিশজন ষণ্ডা ছেলেকে সৈনিক দলভুক্ত করা হল। তারা চিরদিন জিতে এসেছে তাই তাদের মনে কোনো ভয় ছিলনা, তারা চারদিকে বড়াই করে বেড়াতে লাগল—'এবার টাউন ইস্কুলের ছেলেদের মেরে পস্তা উড়িয়ে দেব।'

নেপালের দলও যুদ্ধের জন্যে তৈরী হল। নেপাল ত্রিশজন খুব চালাক আর মজবুত যোদ্ধা বেছে নিলে। রোজ ঢিলছোঁড়া, লাঠি চালনার কুচ-কাওয়াজ চলতে লাগল। নেপাল বাঁশী বাজিয়ে তাদের পরিচালনা করতে লাগল।

শনিবার রাত্রে সমর-সমিতির চারজন সভ্য চুপি-চুপি যুদ্ধক্ষেত্রে গেল—অন্ধকারে ঘণ্টা দুই ধরে তারা কি করলে। তারপর চুপিচুপি ফিরে এল, কেউ জানতে পারলে না।

রবিবারে তিনটে বাজতে না বাজতে, দুই দল যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হল; সকলের হাতে খেজুর ডালের ছড়ি, পকেটে ঢিল ভরা। যুদ্ধক্ষেত্রটি উত্তর, দক্ষিণে প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা—চওড়া ত্রিশ গজ। নেপালের দল দক্ষিণ দিকে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াল। মিশন ইস্কুল উত্তর দিকটা অধিকার করলে।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে নেপাল তার সৈন্যদের এক বক্তৃতা দিলে—'ভাই সব, ধীর ভাবে যুদ্ধ করবে—ঘাবড়াবে না। সেনাপতির হুকুম শোনবামাত্র পালন করবে। বাঁশীর সঙ্কেত মনে আছে ত! এক ফুঁ দিলে আক্রমণ করবে, তুই ফুঁ দিলে পিছু হট্‌বে, আর তিন ফুঁ দিলে—মনে আছে ত! ব্যাস্—বল জয় চামুণ্ডে!'

যুদ্ধ আরম্ভ হল।

তুই পক্ষ প্রথমে নিজেদের কোর্টে থেকে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। নেপালের দল তিন সারিতে সাজানো ছিল—প্রত্যেক সারে দশজন করে। তারা বেশ ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই সব ঢিল তাদের গায়ে পড়ল না। মিশন ইস্কুলের ছেলেরা সার বেঁধে দাঁড়ায় নি, এক জায়গায় জড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল—কাজেই সব ঢিল তাদের মাথায় গিয়ে পড়ছিল।

মিশন ইস্কুলের ছেলেরা যার-যখন-ইচ্ছে ঢিল ছুঁড়ছিল, কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলছিল না। কিন্তু নেপালের দল জেনারেলের হুকুম শুনে ঢিল ছুঁড়ছিল। নেপাল হুকুম দিচ্ছিল—'ফার্ষ্ট্ র‍্যাঙ্ক্, ফায়ার!'—অমনি দশটা ঢিল একসঙ্গে শত্রুর মাথায় গিয়ে পড়ছিল। 'সেকেণ্ড্ র‍্যাঙ্ক, ফায়ার!' অমনি আর একঝাঁক ঢিল ছুটছিল।

ক্রমে দুই দল পরস্পরের বিশ গজের মধ্যে এসে পৌছুল। মিশন দলের ঢিল তখন ফুরিয়ে গেছে—তারা চায় ছড়ি নিয়ে হাতাহাতি যুদ্ধ করতে। কিন্তু নেপালের দল তখনো সমানভাবে ঢিল চালিয়ে যাচ্ছে। মিশন দল আর এগুতে পারছে না; তাদের দলের কয়েকজন জখম হয়ে পেছিয়ে গেল।

নেপাল যখন দেখলে তার দলের ঢিল ফুরিয়ে আসছে তখন সে বাঁশীতে ফুঁ দিলে—পীঁ।

অমনি তার দল 'জয় চামুণ্ডে' বলে ছড়ি নিয়ে বিপক্ষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। মিশন ইস্কুলের ছেলেরাও এই চায়—হাতাহাতি লড়াই করতেই তারা বেশী মজবুত। তারা 'হরহর মহাদেও' বলে মহা উৎসাহে লেগে গেল।

আজ কিন্তু নেপালের দলের বুকে ভীষণ সাহস, সেনাপতির বুদ্ধির ওপর তাদের অফুরন্ত বিশ্বাস। তারা জানে আজ তারাই জয়ী হবে, তাই মহা আনন্দে তারা আক্রমণ করলে। যুদ্ধে দুই পক্ষই আহত হতে লাগল—কারুর পা কেটে গেল, কারুর কপাল ফুলে উঠল; কিন্তু কুচ-কাওয়াজের এমনি গুণ যে নেপালের দলের একটি ছেলেও আজ যুদ্ধ ফেলে পালাল না।

নেপালের বাঁশী বাজল—পীঁ—পীঁ—পীঁ—

পাঁচ মিনিট এই ভাবে যুদ্ধ চলবার পর নেপালের বাঁশী বাজল—'পী—পী'—

নেপালের দল তখন পিছু হটতে আরম্ভ করলে যারা সাম্নে ছিল তারা যুদ্ধ করতে করতে ধীরে ধীরে পিছু হটতে আরম্ভ করলে, যারা পেছিয়ে ছিল তারা নিজের কোটে ফিরে এসে দাঁড়াল। মিশন দলের ছেলেরা দেখলে নেপালের দল রণে ভঙ্গ দিতে আরম্ভ করছে তখন তারা ভাবলে—আর কি! মেরে দিয়েছি' যদিও তারা খুব হাঁপিয়ে পড়েছিল, তবু তারা দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুর কোটে ঢুকে পড়ল।

নেপালের দলের সবাই কোটে ফিরে এসেছে—শত্রু সামনে, বিশ হাত দূরে—এমন সময় আবার নেপালের বাঁশী বাজল—'পী—পী—পী'—

সঙ্গে সঙ্গে নেপালের দল এক আশ্চর্য্য কাজ করলে' হাতের ছড়ি ফেলে দিয়ে বালির ওপর হাত রেখে তারা হাঁটু গেড়ে বসল; আবার যখন তারা উঠে দাঁড়াল তখন তাদের প্রত্যেকের দু'হাতে দুটি ঢিল; নেপাল হুকুম দিলে—'ফায়ার!' অমনি একঝাঁক ঢিল গিয়ে শত্রুর মাথায় পড়ল। তারা এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠ্‌ল,—'জয় চামুণ্ডে!'

মিশন ইস্কুলের ছেলেরা হতভম্ব হয়ে গেল ; ঢিল ত সব যুদ্ধের সুরুতেই ফুরিয়ে গেছে, তবে আবার ঢিল আসে কোথা থেকে ?

তারা কি করে জানবে যে কাল রাত্রে সমর-সমিতির সভ্যরা এসে বালির মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় হাজার হাজার ঢিল পুতে রেখে গেছে। আর, আজ ঠিক সেই জায়গাতেই তারা গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যাপারটা যখন তারা ভাল করে বুঝতে পারলে তখন তাদের বুক দমে গেল। তবু তারা একবার প্রাণ-পণে চেষ্টা করলে সেই জায়গাটা দখল করতে। কিন্তু কার সাধ্য সেদিকে এগোয়! ত্রিশজন ছেলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বন্দুকের ছর্‌রার মতন ঢিল বৃষ্টি করছে।

তাদের হাতের ছড়ি কোনো কাজেই লাগল না। বিশ হাত দূর থেকে ছড়ি আর কি কাজে লাগবে ? এদিকে শিলাবৃষ্টির মত ঢিল এসে পড়ছে। মিশনের ছেলেদের কারুর নাক থেঁতো হয়ে গেল, কারুর মাথা ফুলে উঠ্‌ল, কেউবা পায়ে জখম হয়ে ন্যাংচাতে আরম্ভ করলে।

ক্রমে তারা যখন দেখলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মার খাওয়া ছাড়া আর কোনো লাভই হবে না—তখন তারা একে একে পালাতে আরম্ভ করলে। নেপাল চীৎকার

করে হুকুম দিলে—'জোর্‌সে ভাই। আর একবার। ফায়ার!'

আর মিশন ইস্কুলের দল দাঁড়াতে পারলে না; প্রথমে তাদের সেনাপতি প্রতাপ চোয়ালে এক ঢিল খেয়ে দৌড় মারলে, তারপর আর সকলে যে যেদিকে পেলে চম্পট দিলে। নেপালের দল 'মার মার' করে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে খেদিয়ে দিয়ে এল।

* * * *

ইস্কুলের খেলার মাঠে ফিরে এসে, সকলের সামনে দাঁড়িয়ে গিরীন আর সমরেশ নেপালকে কাঁধে তুলে নিলে। ইস্কুল সুদ্ধ ছেলে এক সঙ্গে গর্জ্জন করে উঠ্‌ল—

'জেনারেল ন্যাপলা কী জয়। নেপোলিয়ন্ কী জয়!'

সাপের হাঁচি

পরীক্ষা দিয়ে সুশান্ত তার মামার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। পাড়াগাঁয়ে মামার বাড়ী; কিন্তু কলকাতা থেকে বেশী দূর নয়—ডায়মণ্ড্‌হারবার লাইনে রেলে চড়লে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেখানে পৌঁছনো যায়।

সকালবেলা প্রায় সাড়ে আট্‌টার সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে সুশান্ত দেখলে—মামার বাড়ীতে হৈহৈ কাণ্ড বেধে গেছে। মামা বেশ ভারিক্কি লোক, বয়স হয়েছে; কিন্তু তাঁর মাথা আজ একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। তিনি কখনো ছ'হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়্‌চেন, কখনো ভীষণ চীৎকার করে গাঁ-সুদ্ধ লোককে গালাগাল দিচ্ছেন। ওদিকে বাড়ীর ভেতরে মামীমা গলা ছেড়ে কান্না সুরু করে দিয়েছেন। তাঁর গলার আওয়াজ যদিও খুব উঁচুতে উঠ্‌ছে, তবু তিনি যে কি বলছেন তা একবর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

মামা যদিও গ্রামের মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু লোক তবু তাঁর বাড়ী মাট-কোঠার—খড়ের চাল। এ অঞ্চলে

পাকা বাড়ীর বড় একটা রেওয়াজ নেই। চণ্ডীমণ্ডপে মামাকে ঘিরে অনেক লোক বসে ছিল, সুশান্ত সেখানে গিয়ে মামাকে প্রণাম করে বললে,—'কি হয়েছে মামা ?'

মামা মাথা থেকে একমুঠি চুল ছিঁড়ে ফেলে বললেন,—'আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছেরে বাবা! ঐ শালা নিধের কাজ—এ আর কেউ নয়। নিধে আজ দেড় মাস হল জেল থেকে বেরিয়েছে—বেটা দাগী চোর। ও ছাড়া আর কারুর কাজ নয়।'

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করলে,—'কিন্তু হয়েছে কি ? নিধে কী ?

মামা গর্জ্জে উঠ্লেন,—'নিধে ? শালা চোর, ডাকাত বোম্বেটে। দত্তদের বাড়ীতে সিঁধ কেটে আড়াই বছর জেলে গিয়েছিল। এবার তাকে ফাঁসি দিয়ে তবে আমি ছাড়্ব।'

মামার কাছে কোনো খবর পাওয়া যাবে না বুঝে সুশান্ত বাড়ীর ভেতর গেল। সামনেই তার দশ বছরের মামাতো বোন কালীকে দেখে বল্লে,—'কি হয়েছে রে কালী ?'

কালী অমনি কেঁদে ফেলে বললে,—'ও দাদা, আমার টায়রা আর হাব—ই—ই—ই—'

সুশান্ত তাকে অনেক প্রশ্ন করলে ; কিন্তু ই ই ই ছাড়া আর কোনো কথাই বার করতে পারলে না। তখন হতাশ হয়ে মামীমার কাছে গিয়ে বললে,—'মামীমা, তোমাদের কি হয়েছে আমাকে বলবে কি ?'

মামীমার কান্না একটু থেমেছিল—আবার আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর তিনি সুশান্তকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে বললেন,—'ঐ ছাখ বাবা, কাল রাত্তিরে চোরে সিঁধ কেটে আমাদের সমস্ত গয়নাগাঁটি চুরি করে নিয়ে গেছে।'

কালী বললে,—'আমার টায়রা আর হার—ই—ই—ই—'

সুশান্ত দেখলে, সত্যিই দেয়ালের মাটি কেটে একটা গর্ত্ত তৈরী করা হয়েছে,—বেশ বড় গর্ত্ত, একটা জোয়ান লোক অনায়াসে তার ভেতর দিয়ে ঢুকতে পারে। ঘরের জিনিষ-পত্র ঠিকই আছে, কেবল যে বাক্সটার মধ্যে গহনা থাকত তার ডালা ভাঙা—ভেতরে কিছু নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীর মুখে সুশান্ত দালানে বসল। মামীমা চোখ মুছতে মুছতে তাকে মুড়ি আর নারকেল-নাড়ু এনে খেতে দিলেন।

খেতে খেতে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করলে,—'কখন তোমরা জানতে পারলে ?'

মামীমা বললেন,—'অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনতে পেলুম, পাশের ঘরে খুট খুট শব্দ হচ্চে। প্রথমটা ভাবলুম বুঝি ইঁদুর ধরবার জন্যে বেরাল ঢুকেছে। কিন্তু তার পরই মনে হল, দরজায় ত তালা লাগানো, জান্‌লাও ভেতর থেকে বন্ধ—বেরাল ঢুক্‌বে কি করে? তখন তোর মামাকে গা ঠেলে তুললুম। তিনি উঠে তালা খুলে দেখলেন, চোর গয়নার সিন্দুক ভেঙে সমস্ত গয়না নিয়ে পালিয়েছে।'

'কতটাকার গয়না ছিল?'

'তা—আমার আর কালীর মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার টাকার' বলে মামীমা ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলেন।

'তারপর?'

'তারপর তোর মামা চেঁচামেচি করে পাড়ার লোক জড় করলেন। সকলেই বললে, এ নিধি হাজ্‌রার কাজ; তার মতন পাকা চোর এ অঞ্চলে আর একটি নেই; এই সেদিন আড়াই বছর জেল খেটে বেরিয়েছে।'

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করলে,—'নিধি হাজরা লোকটা করে কি? ক্ষেত-খামার আছে?'

মামীমা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, গাঁ-সুদ্ধ লোকের নাড়ীর

খবর জানতেন, বললেন,—'দু' বিঘে জমি আছে বাবা কিন্তু সে-জমি চাষও করেনা কিছুই না—এমনি পড়ে থাকে। নিধে কাজ-কর্ম্মও কিছু করেনা, কেবল খিড়কির পুকুরে ছিপ ফেলে বসে বসে মাছ ধরে। অথচ পয়সারও কখনো অভাব হয়না—এই ত জেল থেকে ফিরেই নতুন মাট্‌-কোঠা তুলেছে। কোথা থেকে পয়সা পেল ভগবানই জানেন।'

সুশান্ত ভাবতে ভাবতে বললে,—'হুঁ—তারপর কাল রাত্রে আর কি হল?'

মামীমা বললেন,—'তারপর পুরুষেরা বাইরে কি করলেন তা ত জানিনে বাবা;—এই পেল্লাদকে জিজ্ঞাসা কর—ও বরাবর ওঁদের সঙ্গে ছিল।'

পেল্লাদ বাড়ীর চাকর। সে এতক্ষণ খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে ছিল, বললে,—'রাত্তিরেই সকলে মিলে ঠিক করলেন নিধের বাড়ীতে গিয়ে দেখা যাক সে বাড়ী আছে কিনা। লণ্ঠন জ্বেলে লাঠি-সোঁটা নিয়ে সকলে নিধের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে নিধে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বেরিয়ে এল, যেন ঘুমুচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলে,—'কি হয়েছে ঠাকুর মশায়রা? এত রাত্রে গোলমাল কিসের?'

'নিধে ভয়ানক ধূর্ত্ত সকলেই জানে, তাই তার কথায় কাণ না দিয়ে বাড়ীর চারদিকে খুঁজ্‌তে আরম্ভ করলেন। আদাড়-বাদাড়, ঘর-দোর সমস্ত আতি-পাতি করে খোঁজা হল কিন্তু কোথাও গয়না পাওয়া গেল না। নিধে দাওয়ায় বসে ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ করে তামাক খেতে লাগ্‌ল।'

সুশান্ত হেসে বললে,—'ভারি শয়তান ত! তারপর?'

পেল্লাদ বললে,—'কর্ত্তা তখন আমাকে থানায় পাঠালেন—দারোগা বাবুকে খবর দেবার জন্যে। থানা এখান থেকে আড়াই কোশ পথ—ভোর রাত্তিরে গিয়ে দারোগা বাবুকে তুললুম। তিনি সব শুনে বললেন, আজ সকালে আসবেন।'

সুশান্ত মুড়ি চিবতে চিবতে বসে শুনছিল; অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মামীমাকে জিজ্ঞাসা করলে,—'আচ্ছা, গয়না ছাড়া আর কিছু চুরি যায় নি?'

মামীমা কেবল মাথা নাড়লেন; কালী কিন্তু তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—'হ্যাঁ দাদা, আমার টিয়াপাখীর খাঁচাটাও চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে।'

সুশান্ত আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—'খাঁচা!'

কালী বললে,—'হ্যাঁ, আমার টিয়াপাখীটা মরে গিয়েছিল তাই তার লোহার খাঁচাটা ঐ ঘরে রেখে দিয়েছিলুম। সেটাও চোরে নিয়ে গেছে।'

সুশান্ত ভুরু কুঁচকে বসে ভাবতে লাগল। তাইত! এ ত বড় আশ্চর্য্য চুরি! যে চোর সোনার গয়না চুরি করবার জন্যে সিঁধ কেটেছে, সে একটা তুচ্ছ লোহার খাঁচা চুরি করে কেন?

এই সময় বাইরে একটা গোলমাল এবং মামার হাঁকাহাঁকি—'ওরে, পান নিয়ে আয়—তামাক নিয়ে আয়' শোনা গেল। পেল্লাদ বললে,—'ঐ বুঝি দারোগাবাবু এলেন' বলে তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

সুশান্ত সহরের ছেলে, তাই পাড়াগাঁয়ে দারোগা বাবুদের কি রকম খাতির তা সে জানত না; সেও তাড়াতাড়ি মুড়ি খাওয়া শেষ করে বাইরে গিয়ে হাজির হল।

বাইরে চণ্ডীমণ্ডপে ফরাসের ওপর বসে দারোগাবাবু তখন তামাক টানছেন। একজন কনেষ্টবল্ আর গাঁয়ের ছু'জন চৌকিদার নীচে একটু দূরে উপু হয়ে বসে আছে। চৌকিদারেরা খাতির করে কনেষ্টবলকে খৈনি টিপে দিচ্ছে।

দারোগা বাবুর বয়স হয়েছে—মুখ দেখেই বোধ হয় বেশ বিচক্ষণ লোক। তিনি চোখ বুজে তামাক টানতে টানতে সমস্ত শুনলেন। তারপর বললেন,—'হুঁ'—এ নিধে হাজরার কাজ বলেই মনে হচ্ছে। সে ছাড়া আর

কেউ হতে পারে না। কারণ, এ তল্লাটে আর যত সিঁধেল চোর আছে সবাইকে আমি হাজতে পুরেছি। নিধেটা পরিপক্ক শয়তান—মিটমিটে ডা'ন্—' চৌকিদারদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'হ্যাঁরে, তোরা ত গ্রাম পাহারা দিস্, কাল নিধেকে তুপুর রাত্রে ঘর থেকে বেরুতে দেখেছিস্?'

চৌকিদারেরা হাত জোড় করে বললে,—'আজ্ঞে না, হুজুর।'

দারোগাবাবু তখন বললেন,—'আচ্ছা, চলুন, নিধের ঘর খানাতল্লাস করে দেখা যাক। সে দাগী আসামী; তার ঘর যখন ইচ্ছে খানাতল্লাস করা যেতে পারে। সে যখন গাঁ থেকে বেরোয় নি তখন চোরাই মাল তার বাড়ীতেই আছে।'

মামা বললেন,—'কিন্তু তার বাড়ী কাল রাত্তিরেই আমরা খুব ভাল করে খুঁজেছি।'

দারোগাবাবু হেসে বললেন,—'মুখুজ্যে মশায়, আপনাদের খোঁজা আর আমাদের খোঁজায় অনেক তফাৎ। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে জানেন ত? চলুন।'

দারোগা বাবুর সঙ্গে অনেকে চললেন; সুশান্তও গেল। নিধিরাম হাজরার বাড়ী মিনিট দশেকের রাস্তা। যেতে যেতে সুশান্ত ভাবতে লাগল কেবল সেই খাঁচাটার কথা।

ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার ত। চোর খাঁচা চুরি করলে কেন? পাখী পুষবে বলে? দূর!

তবে? ভাবতে ভাবতে সুশান্তর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ঠিক ত! খাঁচা চুরি করবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—গয়নাগুলো একসঙ্গে তার মধ্যে পুরে কোথাও লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু কোথায় লুকিয়ে রাখবে? গাছের ডালে কিম্বা চালের বাতায় টাঙিয়ে রাখলে ত আর চলবে না; তাহলে যে দেশসুদ্ধ লোক দেখতে পাবে! তবে? একটা লোহার খাঁচা কোথায় লুকিয়ে রাখলে কেউ দেখতে পাবে না?

নিধে হাজরার বাড়ীতে নিধে ছাড়া আর কেউ ছিল না। দারোগাবাবু দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন—কিন্তু নিধের দেখা নেই। অনেকক্ষণ দোর ঠেলাঠেলি আর হাঁকাহাঁকির পর নিধে এসে দোর খুলে দিয়ে সামনে দারোগাবাবুকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললে,—'আসতে আজ্ঞে হোক, হুজুর মশাই।'

দারোগা বাবু চোখ পাকিয়ে বললেন,—'এতক্ষণ কোথায় ছিলিরে? কি করছিলি?'

নিধে হাত জোড় করে বললে,—'আজ্ঞে কর্ত্তা, খিড়কির পুকুরে মাছ ধরছিলুম।'

নিধের চেহারাটি বেঁটে-খাট, তেল চুকচুকে কষ্টি পাথরের মত রং। মুখে শেয়ালের মতন ধূর্ত্ততা মাখানো। দারোগাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন,—'ব্যাটা, জেল থেকে বেরিয়েই আবার আরম্ভ করেছিস্? এবার পাকা দশটি বছর ঘানি টানতে হবে তা জানিস্?'

নিধে মিটমিট করে চেয়ে বললে,—'কর্ত্তা, আমি কিছু জানিনা—মা কালীর দিব্যি। কাল রাতে ঘরে দোর দিয়ে ঘুমুচ্ছিলুম, দাদাঠাকুর দেশসুদ্ধ লোক নিয়ে এসে ঘরে হানা দিলেন। গরীব মানুষ কারুর সাতেও থাকিনা, পাঁচেও থাকিনা—আমারই ওপর এত জুলুম কেন বলুন দেখি? সবাই মিলে ঘর-দোর ওলট-পালট করে দিয়ে চলে গেলেন। এখন আবার হুজুর এসেছেন। বেশ, আপনিও খানাতল্লাস করুন। যদি আমার বাড়ীথেকে কিছু পাওয়া যায় তখন আমাকে কড়াক্কড় করে বেঁধে নিয়ে যাবেন।'

'খানাতল্লাস করব বলেই ত এসেছি'—এই বলে দারোগাবাবু ভেতরে ঢুকলেন। মামা, সুশান্ত আর দু'জন সাক্ষী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল। কনেষ্টবল দোরগোড়ায় পাহারায় রইল, পাড়ার লোকেরা বাইরে জটলা পাকাতে লাগল।

দারোগা বাবু নিধের বাড়ীর গোয়ালথেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর পর্য্যন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সুশান্তের তাতে মন উঠল না ; তার কেবলই মনে হতে লাগল, এখানে নেই—এখানে নেই—

একটা ঘরে অনেক ভাঙা-চোরা পুরোনো জিনিষ রাখাছিল ; সেই ঘরে ঢুকে সুশান্ত দেখলে একটা পাখীর খাঁচা পড়ে রয়েছে। বাঁশের খাঁচাটা হাতে তুলে নিয়ে সুশান্ত দেখলে সেটা বেশ ভাল অবস্থাতেই রয়েছে—ভেঙে-চুরে যায়নি। তার মনে বড় ধোঁকা লাগল। নিধের ঘরেই যখন খাঁচা রয়েছে তখন সে অনর্থক খাঁচা চুরি করতে গেল কেন ?

তারপর বিত্যুতের মত এক নিমেষে সে সমস্ত ব্যাপার বুঝে নিলে। আরে! এটা যে কঞ্চির খাঁচা ; এতে কাজ চলবে কি করে ?

আবিষ্কারের উত্তেজনায় তার বুকের ভেতর ঢিব্ ঢিব্ করতে লাগল কিন্তু সে কাউকে কিছু বললে না। দারোগা বাবু তখন নিধেকে দিয়ে উঠানের একটা কোণ কোদাল দিয়ে খোঁড়াচ্ছিলেন, অন্যদিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। সুশান্ত এই ফাঁকে চুপি চুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

টিকি-মেধ

সাম্‌নেই খিড়কির পুকুর। পুকুরটি ছোট্ট কিন্তু খুব গভীর, কালো জল দেখেই বোঝা যায়। জলের ধারে ধারে বাবলার ডাল ফেলা আছে, যাতে চোরে জাল ফেলে মাছ চুরি করতে না পারে। সুশান্ত দেখলে, ঘাট থেকে ছিপ ফেলা রয়েছে, ফাৎনাটি পুকুরের প্রায় মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে। নিথর জলে ঢেউ নেই, একটা মাছও ঘাই মারছে না।

এদিক ওদিক চেয়ে সুশান্ত ছিপটি তুলে নিলে। ছিপের সুতোর ডগাটি যেখানে বড়শি বাঁধা থাকে হাতে তুলে নিয়ে বেশ ভাল করে দেখলে। তার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। সে আবার ছিপটি যেমন ছিল তেমনি ভাবে রেখে আস্তে আস্তে ফিরে এল।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে, সে পেল্লাদকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে,—'পেল্লাদ, দু'টো বড়শি যোগাড় করতে পারিস ?'

পেল্লাদ বললে,—'পারি দাদাবাবু, বাড়ীতেই আছে।'

'তবে যা—চট করে নিয়ে আয়।'

পেল্লাদ চলে গেল। সুশান্ত বাড়ীর ভেতর ফিরে গিয়ে দেখলে—দারোগা বাবু হতাশ হয়ে দাওয়ার ওপর বসে পড়েছেন। মামারও মুখ শুক্‌নো। কেবল নিধের চোখ মুখ দিয়ে যেন একটা আনন্দের জ্যোতি বেরুচ্ছে।

দারোগা বাবু বললেন, 'নিধে এখনো মাল বের করে দে, তোকে অল্পে ছেড়ে দেব।'

নিধে বললে,—'হুজুর মা-বাপ, ইচ্ছে করলে মারতে পারেন, কাটতে পারেন। আমি কিছু জানিনা।'

দারোগা বাবু আর কি করবেন—চুপ করে রইলেন। নিধের বিরুদ্ধে প্রমাণও ত কিছু নেই যে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন।

তখন সুশান্ত আস্তে আস্তে বললে,—'আমি জানি নিধে চোরাই মাল কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।'

মামা লাফিয়ে উঠে বললেন,—'সেকি! তুই জানলি কি করে?'

সুশান্ত সে কথার উত্তর না দিয়ে নিধেকে জিজ্ঞাসা করলে,—'নিধিরাম, তোমার খিড়কির পুকুরে মাছ আছে?'

নিধিরাম বললে,—'আছে দাদাঠাকুর, ছোট মাছ—পুঁটি, বেলে, ন্যাটা এই সব।'

সুশান্ত বললে,—'তুমি যে সব সময় পুকুরে বসে মাছ ধর, কি দিয়ে মাছ ধর?'

'আজ্ঞে, ছিপ দিয়ে ধরি, দা'ঠাকুর।'

সুশান্ত একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে,—'ছিপ দিয়ে! বড়শি থাকে ত?'

নিধের মুখ এতটুকু হয়ে গেল, চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। সে আমতা আমতা করে বললে—'আজ্ঞে—তা—তা—থাকে বৈকি।'

এই সময় পেল্লাদ ছুটো সূতোয় বাঁধা বঁড়শি এনে সুশান্তর হাতে দিতেই সে বললে—'দারোগা বাবু, একটা মজা দেখবেন ত আসুন। কিন্তু তার আগে নিধিরামের হাতে হাতকড়া দিলে ভাল হয়।'

সুশান্তর কথাবার্ত্তা শুনে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল. সতের বছর বয়সের ছেলের মাথায় যে এত বুদ্ধি থাকতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। দারোগাবাবু কনেষ্টবল্‌কে ডেকে নিধিরামকে দড়ি দিয়ে বাঁধবার হুকুম দিলেন। তারপর সুশান্ত সকলকে নিয়ে খিড়কির ঘাটে গেল।

জল থেকে ছিপ তুলে নিয়ে সুশান্ত সকলকে দেখিয়ে বললে,—'এই দেখুন, নিধিরাম কেমন মজার মাছ ধরে—বঁড়্‌শি নেই। শুধু একটু রাংতা।'

সকলে অবাক। দারোগাবাবু বললেন,—'তাইত।'

সুশান্ত বললে—'নিধিরাম ভারি চালাক। পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই পুকুরে ছিপ ফেলে রেখেছে—ছোট্ট পুকুর, তলায় যদি কিছু থাকে বঁড়শীতে আট্‌কে উঠে

আসবে। কিন্তু ছিপে যে বঁড়শি নেই তা ত আর কেউ জানেনা। তাই সবাই ভাবে পুকুরে কিছু নেই। থাকলে ছিপে উঠে আসত। কি বল নিধিরাম, ঠিক কিনা?'

নিধিরাম নির্ব্বাক—তার মুখে আর কথাটি নেই।

সুশান্ত বললে,—'এবার দেখুন, কি করে সত্যিকারের মাছ ধরতে হয়,'—এই বলে বঁড়্শি ছুটো ছিপের সুতোয় বেঁধে জলে ফেললে। বঁড়্শি তলিয়ে গেল।

তারপর টান মারতেই বঁড়্শি একটা ভারি জিনিষে আট্কালো। সুশান্ত সাবধানে সুতো ধরে টানতে টান্তে বললে,—'কিসে আট্কেছে বলুন দেখি! বুঝতে পারেন নি? খাঁচা—কালীর টিয়াপাখীর লোহার খাঁচা। পুঁট্লি বেঁধে জলে ফেললে পাছে কাপড় পচে গিয়ে গয়নাগুলো হারিয়ে যায় তাই লোহার খাঁচার ব্যবস্থা। কতদিনে পুকুর থেকে চোরাই মাল তোলবার সুবিধে হবে তাত নিধিরাম জান্ত না।'

সুতো ধরে টানতে টানতে শেষে সত্যি সত্যিই একটা লোহার খাঁচা বঁড়্শিতে লেগে উঠে এল। মামা ছুটে গিয়ে খাঁচার মধ্যে হাত পুরে ভেতর থেকে সব জিনিষ বের করলেন। দেখা গেল, মামীমা আর কালীর সমস্ত গয়নাই সেখানে রয়েছে—একটিও খোয়া যায় নি।

*　　*　　*　　*

মামা আহ্লাদে আটখানা হয়ে সুশান্তকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'ছেলে নয়—হীরের টুক্‌রো। এমন বুদ্ধি কেউ দেখেছ? আর হবেই না বা কেন? মামার ভাগনে ত। কথায় বলে—নরাণাং মাতুলক্রমঃ—'

দারোগা বাবুও খুশী হয়ে সুশান্তর পিঠ চাপড়ে বললেন,—'খাসা ছেলে। চমৎকার ছেলে! বেঁচে থাকো বাবা। আশীর্ব্বাদ করি দারোগা হও।'

টিকি-মেধ

পৈতে হবার পর থেকেই নীলু ইয়া বড় এক টিকি রেখেছিল। তারপর ন্যাড়া মাথায় যতই চুল গজাতে লাগ্‌ল সঙ্গে সঙ্গে টিকিও দিব্যি নধর আর পুরুষ্টু হয়ে উঠ্‌ল।

নীলু ভারি ভাল ছেলে। লেখা-পড়ায় তার মন ত আছেই, তার ওপর আবার সন্ধ্যা-আহ্নিকেও খুব চাড়; রোজ দু'বেলা ঠাকুরঘরে বসে এক ঘণ্টা ধরে আহ্নিক করে। এমন্ কি, একাদশীর দিন পাঁজীতে 'সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি' লেখা থাকলেও সে দশবার গায়ত্রীজপ না করে জল খায়না।

তের বছরের ছেলের ধর্ম্মকর্ম্মে এত নিষ্ঠা দেখে নীলুর মা-বাবা খুব খুশী। কিন্তু তার চুকচুকে পাশিলকরা লম্বা টিকির ওপর বাড়ীর সকলেরই নজর পড়েছে। শুধু বাড়ীর নয়, ইস্কুলের ছেলেরাও নীলুর আদরের টিকির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ঐ টিকিটি দেখলেই, কি জানি কেন কুচ্ করে কাঁচি দিয়ে কেটে নেবার জন্যে সকলের হাত নিস্‌পিস্ করে।

অন্য কোনো ছেলে ঐরকম টিকি রাখলে ইস্কুলের ছেলেরা এতদিনে জোর করে সেটা কেটে ফেলে দিত।

কিন্তু নীলুর সঙ্গে চালাকি করবার জো নেই, তার গায়ে ভারি জোর। সে যদি কাউকে একটা চড় মারে তাহলে তাকে বাড়ী গিয়ে তিন দিন সাবু খেতে হবে। তাই জবরদস্তি করে নীলুর টিকিতে হাত দিতে কেউ সাহস করেনা।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে নীলুর টিকি নির্ম্মূল করবার ষড়যন্ত্র চলছে—নিরীহ টিকিটা যেন সকলেরই চক্ষুশূল। একদিন নীলুর বন্ধুরা একত্র হয়ে মন্ত্রণা করতে বসল।

বীরেন বললে,—'এক কাজ করা যাক। ফুট্‌বল ফীল্ডে নীলু যখন খেলতে আসবে তখন খেল্‌তে খেল্‌তে কেউ একজন ওর টিকি ধরে ঝুলে পড়ুক। ব্যাস্‌—এক হ্যাঁচ্‌কায় টিকি একেবারে সাবাড় হয়ে যাবে।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু মুস্কিল এই—হুলোর গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? নীলুর চড়ের বহর সকলেরই জানা ছিল; তার টিকি ধরে ঝুলে পড়তে কেউ রাজি হলনা।

তখন হাবু বললে,—'আর একটা উপায় আছে। রাত্তিরে নীলু যখন ঘুমোয়, সেই সময় চুপি চুপি গিয়ে ওর টিকি কেটে নেওয়া যাক। সকাল বেলা ঘুমিয়ে উঠে নীলু দেখবে টিকি নেই—কিন্তু তখন আর কাকে ধরবে?'

এ প্রস্তাবটা আগের চেয়ে নিরাপদ বটে কিন্তু অনুসন্ধান

করে জানা গেল, যে, টিকি রাখার পর থেকে নীলু ঘরে দোর বন্ধ করে শুতে আরম্ভ করেছে।

বস্তুত, তার টিকির বিরুদ্ধে যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে তা নীলু সন্দেহ করেছিল। তাই টিকি সম্বন্ধে তার সতর্কতার অন্ত ছিল না। কাউকে সে মাথার কাছে হাত আনতে দিত না। আর, কাঁচি কিম্বা ছুরি দেখলেই এমন সন্দিগ্ধ ভাবে তাকাত যেন একটু অন্যমনস্ক হলেই তারা আপনা থেকে এসে তার টিকিটি শেষ করে দেবে।

এসব ছাড়া আল্‌-টপ্‌কা বিপদও অনেক ছিল। একদিন হঠাৎ নীলুর মামা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নীলুর টিকি দেখে বললেন,—'আরে! নীলেটা আবার চৈতন-চুট্‌কি রেখেছে। নিয়ে আয় ত একটা কাঁচি।'

মামার কথা শুনে নীলু একেবারে তার পিসির বাড়ীতে চম্পট দিয়েছিল। যতদিন মামা রইলেন ততদিন আর ফিরে আসেনি।

এইভাবে অতি সন্তর্পণে বেচারা তার সাধের টিকিটি বাঁচিয়ে রেখেছিল।

নীলুদের পাশের বাড়ীতে একটি আট-নয় বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে ছিল—তার নাম পুতুল। সে ছিল নীলুর ছাত্রী—অর্থাৎ শ্লেট্‌-পেনসিল নিয়ে নীলুর কাছে

অঙ্ক শিখতে আস্ত; কখনো বা ফার্ষ্ট বুকের পড়া জেনে নিত। পুতুল নীলুকে ভারি ভালবাসত; নীলুও পুতুলকে ভালবাসত, কিন্তু মনে মনে তাকে একটু ভয়ও করত। কারণ, পুতুল তার মাষ্টার মশাইকে যত না খাতির করত তার চেয়ে ঢের বেশী করত শাসন। সে ছিল একেবারে পাকা গিন্নী। ফুট্‌বল খেলতে গিয়ে নীলু যদি কোনোদিন পা ভেঙে ফেলত—অমনি পুতুলের কাছে তাকে হাজারটা কৈফিয়ৎ দিতে হত। একজামিনে কম নম্বর পেলে পুতুল তাকে ধমক দিত। যেন নীলুই ছাত্র—পুতুল তার মাষ্টার মশাই। পুতুলের শাসনে নীলু মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ত বটে—চড়টা চাপড়টাও কখনো কখনো মারত—কিন্তু তবু তারা পরস্পরকে এত বেশী ভালবাসত যে তাদের মধ্যে সত্যিকারের ঝগড়া কোনোদিন হয়নি।

কিন্তু এই টিকির ব্যাপার নিয়ে দুজনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বাধ্‌বার উপক্রম হল।

প্রথম যেদিন পুতুল টিকি দেখলে—নীলুর পৈতের সময় পুতুল ছিলনা, মামার বাড়ী গিয়েছিল—সেদিন সে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললে,—'ওমা, ও আবার কি। নীলুদা, তুমি একটা বিচ্ছিরি টিকি রেখেছ কেন?'

নীলু চোখ পাকিয়ে বললে,—'বিচ্ছিরি টিকি ? জানিস্ ! পুরাকালে ঋষিরা টিকি রাখতেন ?'

পুতুল বললে,—'তা রাখুন গে। তুমি টিকি কেটে ফেল, তোমাকে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে—ঠিক ভট্‌চাযি মশায়ের মতন।'

নীলু সজোরে মাথার একটা ঝাকানি দিয়ে বললে,—'নাঃ—টিকি আমি কাটব না—টিকি হচ্ছে ব্রাহ্মণের লক্ষণ।'

পুতুল গাল ফুলিয়ে বললে,—'ভারি ত লক্ষণ ! ঠিক ছাতুখোরের মতন দেখায়।'

'দেখাক্ !'

'টিকি কাট্‌বে না ?'

'না।'

'আচ্ছা বেশ, আমিও দেখ্‌ব কেমন তুমি টিকি রাখ।'

নীলুর মনে একটু ভয় হল। ছোট মেয়ে হলে কি হয়, পুতুলের ভারি ফিচ্‌লে বুদ্ধি—সে যে কোন দিক দিয়ে কি করবে কিছুই বলা যায়না। নীলু তাকে ভয় দেখিয়ে বললে,—'খবরদার পুতুল ! আমার টিকিতে নজর দিলে ভাল হবে না। আমিও তাহলে তোর বিনুনি কেটে বেড়ে করে দেব।'

'আচ্ছা—বেশ'—বলে রাগ-রাগ মুখ করে পুতুল চলে গেল।

পুতুল মামার বাড়ী গিয়ে দিদিমার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনেছিল। যাঁরা ভাল লোক তাঁরা কথা দিয়ে কখনো তা লঙ্ঘন করেন না, কর্ণের উপাখ্যান শুনে সে তা জানতে পেরেছিল। তাই কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে নীলুকে অনুনয় করে বললে,—'নীলুদা, তুমি যে বলেছিলে আমাকে একটা জিনিষ দেবে, কৈ দিলেনা?'

নীলু জিজ্ঞাসা করলে,—'কবে বলেছিলুম?'

পুতুল ভালমানুষের মত বললে,—'সেই যে বলেছিলে আমি মামার বাড়ী থেকে ফিরে এলে দেবে!'

নীলু কোনো প্রতিজ্ঞা করেছিল বলে মনে করতে পারলে না; তবু জিজ্ঞাসা করলে।—'কী জিনিষ?'

পুতুল বললে,—'আগে বল দেবে। তুমি নতুন বামুন হয়েছ, এখন ত আর দেব বলে পরে 'না' বলতে পারবে না।'

নীলুর অমনি সন্দেহ যদি টিকি চেয়ে বসে? সে বললে,—'না, আগে বল কি জিনিষ চাই।'

'আগে বল দেবে।'

'না—আগে তুই বল্ কি চাস্?'

পুতুল তখন বললে,—'তোমার টিকিটি আমায় দাও। সত্যি বল্‌ছি, আর কখ্‌খনো তোমার কাছ থেকে কোনো জিনিষ চাইব না।'

নীলু দাঁত বার করে হেসে বললে,—'আমি বুঝেছিলুম তোর মৎলব। সেটি হচ্চে না। তার চেয়ে—

যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দিব_টিকির সঙ্গে মাথা।

তরু সিংএর গল্প জানিস্ ত?'

পুতুল রাগের জ্বালায় দু'মুঠিতে নীলুর চুল ধরে দু'বার ঝাঁকানি দিয়ে দুপ্ দুপ্ করে চলে গেল—'তোমার চেয়ে কর্ণ ঢের ভাল—ব্রাহ্মণকে অঙ্গদ-কুণ্ডল দিয়ে দিয়েছিল। তুমি খারাপ—বিচ্ছিরি—যাচ্ছেতাই—'

অতঃপর নীলু টিকির জন্যে সর্ব্বদা সতর্ক হয়ে বেড়াতে লাগল। বেচারার প্রাণে আর শান্তি রইল না।

এমনি ভাবে কিছুদিন কেটে গেল। একদিন সকাল বেলা নীলু নিজের পড়ার ঘরে চেয়ারে বসে ইস্কুলের পড়া মুখস্থ করছিল, এমন সময় পুতুল এসে আস্তে আস্তে তার চেয়ারের পেছনে দাঁড়াল। নীলু ঘাড় বেঁকিয়ে তাকে দেখে বললে,—'এই মুখপুড়ি, তোর হাতে কি আছে দেখি?'—পুতুলের হাতে ছুরি কিম্বা

কাঁচি আছে কিনা—না দেখে নীলু তাকে কাছে ঘেঁষতে দিত না।

পুতুল হাত তুলে দেখালে,—'এই দেখ।'

অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই দেখে নীলু অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'কি চাস্?'

'কিছু না।'

নীলু তখন পড়ায় মন দিলে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিড়্ বিড়্ করে আকবর বাদশার চরিত্র কেমন ছিল তাই মুখস্থ করতে লাগল।

পড়ায় বেশ মন বসে গিয়েছিল এমন সময় হঠাৎ সে চুলের মধ্যে একটা সুড়্সুড়ি টের পেলে। তাড়াতাড়ি মাথা ফেরাতেই টিকিতে পড়ল টান। 'তবে রে পোড়ার মুখী।' বলে নীলু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠ্ল। পুতুল ধরা পড়ে গিয়ে খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে ছুটে পালাল।

টিকিতে হাত দিয়ে নীলু দেখলে—হায় হায়! পুতুল দাঁত দিয়ে তার টিকির অর্দ্ধেকের বেশী গোড়া পেড়ে কেটে নিয়েছে। লম্বায় ছোট হয়নি বটে—কিন্তু নেংটি ইঁদুরের ল্যাজের মতন একেবারে লিক্লিকে সরু হয়ে গেছে।

রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে নীলু পুতুলকে চারদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল, আর, গর্জ্জাতে লাগল, 'আজ

হাত তুলে দেখালেন—এই দেখ।

ঐ ইঁদুর দাঁতী পেত্নীর দাঁত আমি ভাঙ্‌ব।' কিন্তু পুতুল এমন জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে ছিল যে অনেক খোঁজা-খুঁজিতে তার সন্ধান পাওয়া গেলনা।

একটু ঠাণ্ডা হয়ে নীলু ভাবতে বসল। অনেক ভেবে সে শেষে এক বুদ্ধি বার করলে। বাড়ীতে খালি চায়ের প্যাকেটের অনেক রাংতা পড়ে ছিল, তাই দিয়ে সে তার শীর্ণ টিকিটি আচ্ছা করে আগাগোড়া জড়িয়ে ফেললে-যাতে কোনো অবস্থাতেই কেউ তাতে দাঁত বসাতে না পারে এই ভাবে টিকির দুর্ভেদ্য বর্ম্ম তৈরী করে সে সগর্ব্বে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তার খাপে-ঢাকা টিকি দেখে সকলে হি হি করে হাস্‌তে লাগ্‌ল বটে কিন্তু নীলু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। যারা তার টিকি কাটার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তারা কিন্তু ভারি মুষড়ে গেল। কারণ এর পর তার টিকিতে হস্তক্ষেপ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল।

এম্‌নি ভাবে দিন যেতে লাগল। পুতুলের সঙ্গে নীলুর কথা বন্ধ। পুতুল মারের ভয়ে নীলুর কাছে বড় একটা ঘেঁষে না—কেবল দূর থেকে জিভ ভেঙচিয়ে পালিয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ একদিন পুতুল অসুখে পড়ল। প্রথমে

একটু জ্বর, তারপর ক্রমশঃ অসুখ শক্ত হয়ে উঠল। ডাক্তার বললেন,—টাইফয়েড্।

অসুখের কথা শুনে নীলুর আর রাগ ছিল না—সে রোজ পুতুলকে দেখতে যেত। পুতুল অন্য সময় ছট্‌ফট করত কিন্তু নীলু এসে তার পাশে বসলে সে শান্ত হয়ে থাক্‌ত; কখনো নিজের ছোট্ট রোগা হাতটি নীলুর মুঠির মধ্যে পূরে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

টিকির কথা তাদের মধ্যে আর উঠ্‌তো না।

অসুখ কিন্তু ক্রমে বেড়েই চল্‌ল। সাত দিনের দিন নীলু খবর পেলে—ডাক্তার বলেছেন পুতুলের মাথা ন্যাড়া করে দিতে হবে। তাই শুনে পুতুল ভারি কান্নাকাটি করছে, সে কিছুতেই মাথা মুড়োতে চায় না। কেঁদে কেঁদে তার জ্বর আরো বেড়ে গেছে।

শুনেই নীলু পুতুলদের বাড়ী গেল। দেখলে, পুতুল বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে—তার দু'চোখ জবা ফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে।

নীলুকে দেখে পুতুল বলে উঠ্‌ল,-'না নীলুদা, আমি মাথা ন্যাড়া করব না। আমাকে ভারি বিচ্ছিরি দেখাবে,' বলেই জোরে কেঁদে উঠ্‌ল।

নীলু তার রুক্ষ কটা চুলের ওপর হাত বুলিয়ে বললে,-

'ছি পুতুল, কাঁদতে নেই—অসুখ হলে ডাক্তার বাবুর কথা কি অমান্য করে? দেখিস্ না, এবার তোর কেমন সুন্দর চুল গজাবে-একেবারে কুচকুচে কালো।'

'না না না—আমি ন্যাড়া হবনা,' বলে পুতুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগল।

নীলু তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলে—কিন্তু পুতুল কিছুতেই বুঝল না, কেবল কাঁদ্‌তে লাগল। ডাক্তারবাবু আর বাড়ীর লোকেরা তার কান্না দেখে ভারি বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু উপায় নেই-মাথা ন্যাড়া করতেই হবে। তা না হলে ভাল রকম চিকিৎসা হবে না।

নীলু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ভাবলে। কি করা যায়? পুতুলের এমন কোঁক্‌ড়ানো চুল কামিয়ে ফেলতে হবে শুনে তারও মন কেমন করছিল কিন্তু কি করবে? উপায় ত নেই। ডাক্তারবাবু যখন বলেছেন তখন পুতুলকে ন্যাড়া হতেই হবে।

একটা উপায় আছে পুতুলকে রাজি করাবার। কিন্তু সে কথা ভাবতেই নীলুর বুকের ভেতরটা টনটন্ করতে লাগল। আহা, তার এত আদরের—

যাহোক, সে জোর করে টিকির শোক মন থেকে দূরে সরিয়ে দিলে। তারপর পুতুলের কানের কাছে মুখ নিয়ে

'আমি যদি টিকি কেটে ফেলি—'

গিয়ে চুপি চুপি বললে, 'আচ্ছা পুতুল আমি যদি টিকি কেটে ফেলি তাহলে তুই ন্যাড়া হবি ?'

পুতুল কিছুক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে রইল, তারপর বললে,—'তুমি টিকি কেটে ফেলবে ? সত্যি ?'

'হ্যাঁ সত্যি—তুই যদি ন্যাড়া হোস্।'

পুতুলের রোগা মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, সে চোখ মুছে বললে,—'আচ্ছা। কিন্তু তুমি আগে টিকি কাটো. আমি দেখি।'

নাপিত হাজির ছিল। সে এসে নীলুর রাংতা-মোড়া টিকি কচাং করে কেটে ফেল্‌লে।

তখন, কাটা টিকিটি নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে পুতুল বললে,—'এবার আমায় ন্যাড়া করে দাও।' তারপর নীলুর দিকে চেয়ে মিটি মিটি হেসে বললে,—'বলেছিলুম কিনা যে তোমার টিকি কেটে তবে আমি ছাড়ব ?'

নীলু লজ্জিত ভাবে হেসে বললে,—'তুই ভারি দুষ্টু।'

-শেষ-